শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বৈকুণ্ঠের উইল

১

বৎসর পাঁচ-ছয় পূর্ব্বে বাবুগঞ্জের বৈকুণ্ঠ মজুমদারের মুদির দোকান যখন অনেক প্রকার ঝড়-ঝাপ্টা সহ্য করিয়াও টিকিয়া গেল, তখন অনেকেই বিস্ময় প্রকাশ করিল। কারণ, কি করিয়া যে বৈকুণ্ঠ তাল সাম্‌লাইল, তাহা কেহই জানে না। সেই অবধি দোকানখানি ধীরে ধীরে উন্নতির পথেই অগ্রসর হইতেছিল।

আবার তেমন দুঃখ-কষ্ট আর যখন রহিল না, অথচ বৈকুণ্ঠ তাহার বড়ছেলে গোকুলকে ইস্কুল ছাড়াইয়া নিজের দোকানে ভর্ত্তি করিয়া দিল, তখনও পাড়ার পাঁচজন কম আশ্চর্য্য বোধ করিল না। তাহারা বৈকুণ্ঠের আচরণ সম্বন্ধে বলাবলি করিতে লাগিল, দেখলে বুড়োর ব্যবহার! না হয় ছেলেটির তেমন ধার নাই—এক বছর না হয় কেলাসে উঠতেই পারে নাই; তাই ব'লে এই কাজ! ওর মা বেঁচে থাকলে কি এরূপ করতে পারত! কই ছাড়িয়ে দিক দেখি ওর ছোট-ছেলে বিনোদকে! ছোটগিন্নী ঝেঁটিয়ে বিষ ঝেড়ে দেবে!

বস্তুতঃ গোকুল ছেলেটি মেধাবী ছিল না। [illegible] [illegible]

কোনদিনই প্রায় ভাল পড়া বলিতে পারিত না। পরীক্ষার ফল বাহির হইলে, সে মুখখানি ম্লান করিয়া তাহার বিমাতার কাছে আসিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

বিমাতা তাহাকে কোলে টানিয়া সস্নেহে মাথায় মুখে হাত বুলাইয়া দিয়া স্নিগ্ধ স্বরে কহিলেন, গোকুল, বেঁচে থাক্‌তে গেলে এমন কতশত দুঃখ সইতে হয় বাবা! মনের কষ্ট যে ছেলে হাসিমুখে সহ্য ক'রে আবার চেষ্টা করে, সেই ত ছেলের মত ছেলে। কেঁদ না বাবা, আবার মন দিয়ে পড়, আসচে বছর পাশ হবে।

ছোটছেলে বিনোদ লাফাইতে লাফাইতে বাড়ি আসিল। সে দাদার চেয়ে বছর-ছয়ের ছোট, তিন-চার ক্লাস নিচেও পড়ে; কিন্তু সে একেবারে প্রথম হইয়া ডবল প্রমোশন পাইয়াছে। পুত্রের সুসংবাদ শুনিয়া মা তাহাকে কোলে টানিয়া লইলেন এবং পুলকিত চিত্তে অসংখ্য আশীর্ব্বাদ করিলেন।

সন্ধ্যার পর বৈকুণ্ঠ দোকানের কাজ সারিয়া খাতা বগলে ঘরে আসিয়া উভয় পুত্রের বিবরণ শুনিয়া ভালমন্দ কিছুই বলিলেন না। ছেলেদের ভার তাহাদের মায়ের উপর দিয়াই তিনি নিশ্চিন্ত ছিলেন। হাত পা ধুইয়া জল খাইয়া পান চিবাইতে চিবাইতে ধীরে-সুস্থে নিত্যনিয়মিত খাতা দেখিতে বসিয়া গেলেন।

২

আমার মা ভবানী কই গো? বলিয়া লাঠির গোটা-দুই ঠোকা দিয়া ইস্কুলের ষষ্ঠ শিক্ষক জয়লাল বাঁড়ুয্যে সেইদিন সন্ধ্যাকালেই বৈকুণ্ঠ মজুমদারের বাড়ির ভিতরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি বৈকুণ্ঠের গোলদারী দোকানে চাল-ডাল-ঘি-তেল বাবদে অনেক টাকা বাকি ফেলিয়া গৃহিণীকে মাতৃ-সম্বোধন করিয়াছিলেন।

ভবানী সন্ধ্যার কাজকর্ম্ম সারিয়া বারান্দায় মাদুর পাতিয়া ছেলে দুটিকে কোলের কাছে লইয়া বসিয়াছিলেন। শশব্যস্তে উঠিয়া আসন পাতিয়া দিলেন। বাঁড়ুয্যেমশাই উপবেশন করিয়াই সুরু করিয়া দিলেন, হাঁ, রত্নগর্ভা বটে মা তুমি! ছেলে পেটে ধরেছিলে বটে! এত ছোকরার মধ্যে তোমার বিনোদ একেবারে ফার্ষ্ট। একেবারে ডবল প্রমোশন! ওর নম্বর পাওয়া দেখে হেড মাষ্টার মশাইয়ের পর্য্যন্ত তাক্ লেগে গেছে। আজ তাঁকেও গালে হাত দিয়ে দাঁড়াতে হয়েছে! আমিও ত মা, এই ছেলে চরিয়েই বুড়ো হলুম; কিন্তু তোমার এই বিনোদ ছেলেটির মত ছেলে কখনও চোখে দেখলুম না। আমি এই ব'লে যাচ্ছি আজ, ও ছেলে তোমার হাইকোর্টের জজ হবে—হবেই হবে।

ভবানী চুপ করিয়া রহিলেন। বাঁড়ুয্যেমশাই উৎসাহিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, আর এই গোকুলো! কিসে আর কিসে! এ ছোঁড়া এত বড় গাধার সর্দ্দার মা, একজামিনের দিন আমিই ত ছিলুম এদের পাহারায়—কত ছেলে টেবিলের নীচে

দীঘি বই খুলে কাপি করে দিলে—ওরই ডাইনে বাঁয়ে মল্লিকদের দুই ছেলে বই খুলে লিখতে লাগল—আমি দেখেও দেখলুম না—বরং হতভাগাটাকে চোখ টিপে একটা ইসারা পর্য্যন্ত করে দিলুম, কিন্তু সেই যে বোদা বলদের মত হাত গুটিয়ে বসে রইল, কোনদিকে চোখ পর্য্যন্ত ফেরালে না। নইলে আশু মল্লিকের ছেলে পাশ হয়, আর ও হ'তে পারে না! সত্যি কি না, ওকেই জিজ্ঞেসা করে দেখ দেখি মা। বলিয়া জয়লাল মাষ্টার লাঠিটা তুলিয়া লইয়া সহসা গোকুলের প্রতি একটা খোঁচানোর ভঙ্গী করিয়াই আপাততঃ কোনমতে তাঁর অস্থি-মজ্জাগত ছেলে-ঠ্যাঙানোর প্রবৃত্তিটা শান্ত করিয়া লইলেন। কিন্তু গোকুল ভয়ে শিহরিয়া উঠিল। নিমিষের মধ্যে ভবানী দুই বাহু বাড়াইয়া তাঁর এই সপত্নীপুত্রটিকে বুকের কাছে টানিয়া লইলেন। গোকুলের মা নাই। মাকে তাহার মনেও পড়ে না। এই বিমাতার কাছেই সে মানুষ হইয়াছে। আজই ইস্কুল হইতে ফিরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে যখন সে তাহার কাছে আসিয়া পড়িল, তখন হইতে আর তাহাকে তিনি কাছছাড়া করেন নাই এবং এতক্ষণে তাঁহাদের চুপি চুপি এই সকল কথাই হইতেছিল! গোকুলের মাথায় মুখে হাত বুলাইয়া স্নেহার্দ্র মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, হাঁ বাবা, আর সব ছেলেরা বই দেখেছিল, তুমি শুধু কোন দিকে তাকিয়ে দেখও নি?

গোকুল কিছুই বলিতে পারিল না। নিজের অক্ষমতার ইহাও একটা প্রকৃষ্ট প্রমাণ মনে করিয়া সে লজ্জায় একেবারে অধোবদন হইয়া গেল। কিন্তু কথাটা ঘরের মধ্যে বৈকুণ্ঠের

কানে যাওয়ায় তিনি হিসাবের খাতা হইতে মুখ তুলিয়া একেবারে কান-খাড়া করিয়া রহিলেন।

ভবানী মৃদু হাসিয়া কহিলেন, এ বছর খুব মন দিয়ে পড়লে আসচে বছর ও-ও ফার্ষ্ট হতে পারবে।

বিমাতার এই স্নেহের কণ্ঠস্বর বাঁড়ুয্যেমশাই চিনিতে পারিলেন না। সপত্নীপুত্রের প্রতি স্ত্রীলোকের বিদ্বেষ তাঁহার কাছে এম্নি স্বতঃসিদ্ধ সত্য যে কোথাও কোন ক্ষেত্রেই যে ইহার ব্যতিক্রম ঘটিতে পারে, সে কথাও তাঁহার মনে উদয় হইল না। ইহাকে একটা মৌখিক শিষ্টতামাত্র জ্ঞান করিয়া তিনি গোক্‌লোকে আরও তুচ্ছ করিয়া দেখাইবার অভিপ্রায়ে জিহ্বার দ্বারা তালুতে একপ্রকার শব্দ উৎপাদন করিয়া বলিলেন, হায় হায়! গোক্‌লো হবে ফার্ষ্ট। পূবের সূয্যি উঠবে পশ্চিমে। যে ফার্ষ্ট হবে মা সে ঐ তোমার বাঁ দিকে শুনচে। বলিয়া তিনি অঙ্গুলিসঙ্কেতে বিনোদকে নির্দ্দেশ করিয়া হঠাৎ একটুখানি কাষ্ঠ হাসির রসান্ দিয়া বলিলেন, তাই কি ছোঁড়ার লজ্জাসরম আছে! উল্টে ছেলেদের সঙ্গে কোঁদল করছিল যে 'আমি পাশ হই নি বটে, কিন্তু আমার ছোটভাই যে সকলের প্রথম হ'য়েচে! তোদের কটা ভাই এমন ডবল প্রমোশন পেয়েচে বল্ ত রে!' শোন একবার কথা মা! ছোটভাই ফার্ষ্ট হ'য়েচে—কোথায় ও লজ্জায় মরে যাবে, না, ওর দেমাক্ দেখ!

ভবানী আর থাকিতে পারিলেন না, জোর করিয়া গোকুলকে টানিয়া লইয়া তাহার মাথাটা বুকের উপর চাপিয়া ধরিলেন গোকুল লজ্জায় মরিয়া গিয়া মায়ের বুকে মুখ লুকাইয়া চুপ

করিয়া বসিয়া রহিল। গোকুল তাহার ছোটভাইটিকে যে কত ভালবাসিত, তাহা তিনি জানিতেন।

বাঁড়ুয্যেমশাই আরও গুটিকয়েক বাছা বাছা কথা বলিয়া তাঁহার বিনোদকে এই সময় হইতেই যে বাটীতে উপযুক্ত শিক্ষক নিযুক্ত করিয়া পড়ান উচিত, ইহাই জানাইতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু হঠাৎ এই সময়ে পাশের ঘরের এক ঝলক আলো মাতা-পুত্রের গায়ের উপর আসিয়া পড়ায় তাঁহার মনে যেন একটু খট্‌কা বাজিল। ভবানী যেমন করিয়া এই নির্ব্বোধ সপত্নীপুত্রকে বুকে লইয়া তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতেছিলেন, তাহা ঠিক যেমনটি হওয়া উচিত, তেমনটি নয় বলিয়াই তাঁহার সন্দেহ জন্মিল। সুতরাং এই তুলনামূলক সমালোচনা সম্প্রতি আর অধিক ঠেলিয়া লইয়া যাওয়া উচিত হইবে কি না, তাহা ঠিক ঠাহর করিতে না পারায় তাঁহাকে অন্য কথা পাড়িতে হইল।

ভবানী এতক্ষণ প্রায় চুপ করিয়াই শুনিতেছিলেন। এখনও বেশি কথা কহিলেন না। অবশেষে রাত্রি হইতেছে বলিয়া বাঁড়ুয্যেমশাই বহুপ্রকার আশীর্ব্বচন উচ্চারণ করিয়া এবং ভবিষ্যতে বিনোদের জজিয়তি প্রাপ্তির সম্ভাবনা বারংবার নিঃসংশয়ে জানাইয়া দিয়া লাঠিটি হাতে করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন। ঘরের মধ্যে বসিয়া বৈকুণ্ঠ ঠিক যেন এই সময়টির জন্যই অপেক্ষা করিতেছিলেন। সুমুখে আসিয়া কঠোরভাবে প্রশ্ন করিলেন, হাঁ রে গোক্‌লো, সবাই বই দেখে লিখে পাশ হয়ে গেল, তুই লিখলি না কেন?

গোকুল ভয়ে কাঁটা হইয়া পূর্ব্ববৎ লুকাইয়া রহিল।

অনেক ধমক-টমকের পর সে যাহা কহিল, তাহার ভাবার্থ এই যে, পূর্ব্বাহ্নেই হেডমাষ্টার মহাশয় আসিয়া চুরি করিয়া দেখা-দেখি করিয়া লিখিতে নিষেধ করিয়া দিয়া গিয়াছিলেন।

বৈকুণ্ঠ কিছুক্ষণ নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া কি যেন চিন্তা করিলেন, পরে বলিলেন, কাল থেকে আর তোকে ইস্কুলে যেতে হবে না, আমার সঙ্গে দোকান যাবি। বলিয়া ঘরে ফিরিয়া গিয়া নিজের কাজে মন দিলেন। ইহা একটা মামুলি শাসনমাত্র মনে করিয়া ভবানী তখন কথা কহিলেন না। কিন্তু পরদিন সকাল-বেলা বৈকুণ্ঠ যখন সত্য সত্যই গোকুলকে দোকানে লইয়া যাইতে চাহিলেন, তখন তিনি আগুন হইয়া উঠিয়া ঘোরতর আপত্তি করিয়া বলিলেন, যে কথা নয়, সেই কথা! দুধের ছেলে যাবে তোমার দোকান করতে? সে হবে না— আমি বেঁচে থাক্‌তে আমার গোকুলকে পড়া ছাড়তে দেব না। এমন রাগ ত দেখি নি! বলিয়া গৃহিণী ক্রোধভরে ছেলেকে টানিয়া লইয়া যাইতেছিলেন, বৈকুণ্ঠ ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, কে রাগ করেছে ছোটবৌ?

গৃহিণী কহিলেন, তুমি। আবার কে?

আমাকে রাগ কর্‌তে কখনও দেখেচ?

এ তবে তোমার কি রকম কথা শুনি? ছেলে-বেলা পাশ-ফেল সবাই হয়। তাই বলে ইস্কুল ছাড়িয়ে দেবে?

বৈকুণ্ঠ তখন গোকুলকে অন্যত্র পাঠাইয়া দিয়া হাসিমুখে বলিলেন, ছোটবৌ, রাগ আমি করি নি। তোমার বড়ছেলেকে আজ বড় আহ্লাদ করেই আমি দোকানে নিয়ে যাচ্ছি। ছোট-

ছেলে তোমার কখনও জজিয়তি পাবে কি না, বাঁড়ুয্যেমশায়ের মত সে ভরসা তোমাকে দিতে পারলুম না ; কিন্তু আমার অবর্ত্তমানে, গোকুলের ওপর যে তোমরা নির্ভয়ে ভর দিতে পারবে, সে আমি তোমাকে নিশ্চয় বলে দিচ্চি।

স্বামীর অবিদ্যমানতার কথায় ভবানীর চোখের কোণ এক মুহূর্ত্তেই আর্দ্র হইয়া উঠিল। বলিলেন, সে আমি জানি। কিন্তু গোকুল যে বড্ড সোজা মানুষ—ও কি তোমার ব্যবসার ঘোর-প্যাঁচই বুঝতে পারবে ? ওকে হয় ত সবাই ঠকিয়ে নেবে।

বৈকুণ্ঠ হাসিয়া কহিলেন, সবাই ঠকাবে না। তবে কেউ কেউ ঠকিয়ে নেবে, সে কথা সত্য। তা নিক্, কিন্তু ও ত কারুকে ঠকাবে না ? তা হলেই হবে। মা লক্ষ্মী ওর হাতে আপনি এসে ধরা দেবেন। বলিতে বলিতে বৈকুণ্ঠের নিজের চোখও সজল হইয়া উঠিল। তিনি নিজেও খাঁটি লোক, কিন্তু মূলধনের অভাবে অনেকদিন অনেক কষ্টই ভোগ করিয়াছেন। এখন যদি বা কিছু সংগ্রহ হইয়াছে, কিন্তু সময়ও ঘনাইয়া আসিয়াছে। সে শক্তি-সামর্থ্যও আর নাই। তাড়াতাড়ি চোখের উপর হাতটা বুলাইয়া লইয়া হাসিয়া বলিলেন, গিন্নী, এই বয়সে গোকুল যত লোভ কাটিয়ে বেরিয়ে এসেচে, সে যে কত শক্ত, তা তুমি হয় ত বুঝতে পারবে না। যে এ পারে, তার ত ব্যবসার ঘোর-প্যাঁচ চৌদ্দ আনা শেখা হয়ে গেছে। শুধু বাকি দুটো আনা আমি তাকে শিখিয়ে দিয়ে যাব।

কিন্তু লোকে কি বল্‌বে ?

লোকের কথা ত জানি নে ছোটবৌ। আমি শুধু আমাদের

কথাই জানি। আমি জানি, ওর হাতে তোমাদের সঁপে দিয়ে আমি নির্ভয়ে দুচক্ষু বুজতে পারব।

ভবানী নিজেও কিছুদিন হইতে লক্ষ্য করিতেছিলেন, তাঁর স্বামীর স্বাস্থ্য যেন দিন দিন ভাঙিয়া পড়িতেছিল। তাঁর শেষ কথায় একটা আসন্ন বিপদের বার্তা অনুভব করিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিলেন, আচ্ছা, নিয়ে যাও! বলিয়া নিজে গিয়া গোকুলকে ডাকিয়া আনিয়া স্বামীর হাতে সঁপিয়া দিলেন। তাহার মুখ চুম্বন করিয়া বলিলেন, ওঁর সঙ্গে দোকানে যাও বাবা! তুমি মানুষ হলেই তবে আমরা দাঁড়াতে পারব।

গোকুল পিতা-মাতার মুখের পানে চাহিয়া বিস্মিত হইল। সে বেচারা কাল রাত্রেই বিছানায় শুইয়া মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, এ বৎসর যেমন করিয়া হোক্ উত্তীর্ণ হইবেই। ইস্কুল ছাড়িয়া দোকান যাইতে কোন ছেলেই গৌরব বোধ করে না; কিন্তু কোন দিনই সে মায়ের অবাধ্য নহে। সহপাঠীদের বিদ্রূপের খোঁচা তাহার মনে বাজিতে লাগিল, কিন্তু সে কোন আপত্তি করিল না, নিঃশব্দে পিতার অনুসরণ করিল।

৩

দশ বৎসর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে, জরাগ্রস্ত বৈকুণ্ঠ নিজেও মরিতে বসিয়াছে। কিন্তু গোকুলের সম্বন্ধে সে ভুল করে নাই, তাহা তাহার বাড়িটার পানে চাহিলেই বুঝা যায়। গঞ্জের ভিতর সে মুদির দোকান আর নাই। তাহার পরিবর্তে প্রকাণ্ড গোলদারী দোকান। সেখানে লাখো টাকার কারবার চলিতেছে।

বিনোদ কলিকাতায় থাকিয়া এম্-এ পড়ে। বৈকুণ্ঠ নাতি-নাতনীর মুখ দেখিয়া পরম সুখে মরিতে পারিত, কিন্তু কিছুদিন হইতে ছোটছেলের সম্বন্ধে নানাপ্রকার কুৎসিত জনশ্রুতিতে তাহার অবশিষ্ট দিনগুলা বড় ভারী হইয়া উঠিয়াছে।

সেদিন সকালে বৈকুণ্ঠ জীবনের শেষ ডাক শুনিতে পাইলেন। সর্ব্বাঙ্গে কি একপ্রকার নূতন অস্বস্তি লইয়া জাগিয়া উঠিয়া গৃহিণীকে শয্যাপার্শ্বে ডাকিয়া ম্লানভাবে একটুখানি হাসিয়া কহিলেন, ছোটবৌ, আমার ত সময় হয়েছে, তাই একটু এগিয়ে চল্‌লুম। তোমার যতদিন না আসা হয় ততদিন আমার ছেলে দুটিকে দেখো। তোমার হাতেই তাদের দিয়ে গেলুম।

স্বামীর শীর্ণ হাতখানি দুই হাতের মধ্যে লইয়া ভবানী নীরবে কাঁদিতে লাগিলেন।

বৈকুণ্ঠ কহিলেন, গোকুলকে রেখে তার মা মারা গেলে—আমার কিছুতেই আর দ্বিতীয় সংসার করবার ইচ্ছা ছিল না। আমি কোনমতেই বিয়ে করতুম না ; কিন্তু যখন দেখলুম আমি একা, গোকুলকেই হয় ত বাঁচাতে পার্‌ব না, তখনই শুধু বড় কষ্টে, বড় ভয়ে ভয়ে রাজী হয়েছিলুম। ভগবান আমার মনের কথা জান্‌তে পেরেছিলেন। তাই এমন স্ত্রী দিলেন যে, কোন-দিন কোন দুঃখ পাই নি। শুধু বিনোদ যদি আমার শেষকাল-টায় এত দুঃখ না দিত, তা হলে কত সুখেই না আজ যেতে পারতুম। বলিতে বলিতেই তাঁহার ম্লান চক্ষু দুটি অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিল। ভবানী আঁচল দিয়া তাহা মুছাইয়া দিলেন, কিন্তু তাঁহার নিজের দুইচক্ষু অশ্রুজলে ভাসিয়া যাইতে লাগিল।

বৈকুণ্ঠ কহিলেন, আমি মরতেও পারচি নে ছোটবৌ, আমার অবর্ত্তমানে আমার এত কষ্টের দোকানটি বিনোদ হাতে পেয়ে দুদিনে নষ্ট ক'রে ফেল্‌বে। এ শোক আমি পরকালে বসেও সহ্য করতে পারব না—সেখানেও আমার বুকে শেল বাজবে।

একটুখানি থামিয়া কহিলেন, শুধু কি তাই? তোমার দাঁড়াবার স্থান থাক্‌বে না—আমার গোকুলকেও হয় ত ছেলে-মেয়ে নিয়ে পথে বস্‌তে হবে, বলিতে বলিতেই বৈকুণ্ঠ ভয়ে কাঁপিয়া উঠিলেন। এরূপ দুর্ঘটনার কল্পনামাত্রেই তাঁহার বক্ষস্পন্দন থামিয়া যাইবার উপক্রম করিল। ভবানী তাড়াতাড়ি স্বামীর মুখের উপর মুখ আনিয়া কাঁদিয়া কহিলেন, ওগো, বিনোদকে তুমি কিছুই দিয়ে যেও না। তোমার গায়ের রক্ত জল-করা জিনিস আমি কারুকে দেব না। দোকান্, ঘর, বাড়ি, বিষয়-সম্পত্তি সমস্ত তুমি গোকুলকে লিখে দিয়ে যাও। তুমি শান্ত হও—নিশ্চিন্ত হও—আমি নিজে তার সাক্ষী হয়ে থাক্‌ব।

বৈকুণ্ঠ কিছুক্ষণ স্ত্রীর মুখপানে চাহিয়া থাকিয়া একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, কেবল এই কথাই আমি দিবারাত্রি ভাবছি ছোটবৌ, আমি ভগবানকে পর্য্যন্ত মন দিয়ে ডাক্‌তে পার্‌চি নে! কিন্তু তুমি কি এতে মত দিতে পার্‌বে? বলিয়া বৈকুণ্ঠ হতাশভাবে আর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। ভবানীর বুক ফাটিয়া গেল। তিনি মরণোন্মুখ স্বামীর বুকের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া অশ্রুজড়িতকণ্ঠে কহিলেন, ওগো, আমি মত দিতে পার্‌ব। তোমাকে ছুঁয়ে বল্‌চি পার্‌ব। আমি

আর কিছুই চাই নে, শুধু চাই, তুমি নিশ্চিন্ত হও—সুস্থ হও। এ সময়ে তোমার মনে যেন কোন ক্ষোভ, কোন ক্লেশ না থাক্‌তে পায়।

বৈকুণ্ঠ আবার কিছুক্ষণ নীরবে চাহিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন, কিন্তু বিনোদ?

ভবানী নিমিষমাত্র দেরি না করিয়া কহিলেন, তার কথা তুমি ভেবো না। সে লেখাপড়া শিখ্‌চে—নিজের পথ সে নিজে করে নেবে। আর যত মন্দই হোক্—গোকুল তাকে ফেল্‌তে পারবে না—ছোটভাইকে সে দেখ্‌বেই।

বৈকুণ্ঠ আর কথা কহিলেন না। একটা তৃপ্তির নিশ্বাস মোচন করিয়া ধীরে ধীরে পাশ ফিরিয়া শুইলেন। ভবানী সেইখানে একভাবে পাথরের মূর্ত্তির মত বসিয়া রহিলেন, নিদারুণ অভিমানে তাঁহার দুইচক্ষু বাহিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। তাঁহার গর্ভের সন্তানকে স্বামী বিশ্বাস করিতে পারিলেন না, মন্দ বলিয়া মৃত্যুকালে পুত্রের ন্যায্য অধিকার হইতে তাহাকে বঞ্চিত করিতে চাহিলেন, এ দুঃখ তাঁহার বক্ষে যেন কি শূল বিদ্ধ করিল, তাহা তিনি একবার চাহিয়াও দেখিলেন না। সে মন্দ হোক, যা হোক, তিনি ত মা? সে ত তাঁহারই সন্তান? সেই দুর্ভাগ্য সন্তানের অন্ধকার-ভবিষ্যৎ চোখের উপর সুস্পষ্ট দেখিয়া তাঁহার মাতৃহৃদয় এইবার মাথা কুটিয়া কুটিয়া কাঁদিতে লাগিল। কিন্তু পিছাইয়া পরিত্রাণ পাইবার কোন উপায় কোন দিকে চাহিয়া চোখে পড়িল না। মুমূর্ষু স্বামীর তৃপ্তির জন্য সন্তানের সর্ব্বনাশের পথ যখন নিজেই

অঙ্গুলিসঙ্কেতে দেখাইয়া দিয়াছেন, তখন কে তাঁহার মুখ চাহিয়া সে পথ যাচিয়া রুদ্ধ করিয়া দিতে আসিবে?

সেইদিনই অপরাহ্ণ-কালে উকিল ডাকিয়া রীতিমত উইল লেখা হইয়া গেল। বৈকুণ্ঠ স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি তাঁহার বড়ছেলেকে লিখিয়া দিলেন। সাক্ষী হইয়া নাম লিখিতে গিয়া ভবানীর হাত কাঁপিয়া গেল। মাতৃস্নেহ কোথায় অলক্ষ্যে বসিয়া বারংবার তাঁহার হাত চাপিয়া ধরিতে লাগিল, কিন্তু নিবৃত্ত করিতে পারিল না। স্বামীর পা দুইখানি অন্তরের মধ্যে দৃঢ়-স্থাপিত করিয়া তিনি আঁকাবাঁকা অক্ষরে নিজের নাম সই করিয়া দিলেন। বিনোদ কোন কথাই জানিল না। সে তখন কলিকাতার এক অপবিত্র পল্লীতে, ততোধিক অপবিত্র সংসর্গে মদ খাইয়া মাতাল হইয়া রহিল। বাটী হইতে যে দুইজন কর্ম্মচারী তাহাকে লইয়া যাইতে আসিয়াছিল, তাহারা দুইদিন পর্য্যন্ত তাহার বাসায় বৃথা অপেক্ষা করিয়া ফিরিয়া আসিল। কেহই এ সংবাদ বৈকুণ্ঠকে দিতে সাহস করিল না। তিনিও এ সম্বন্ধে কাহাকেও কোন প্রশ্ন করিলেন না। কিন্তু কিছুই তাঁহার কাছে চাপা রহিল না।

আরও দিন-দুই টালে বেটালে কাটিয়া আজ সকাল হইতেই তাঁহার শ্বাসকষ্ট প্রকাশ পাইয়াছিল। সমস্ত দিন আচ্ছন্নের মত পড়িয়া থাকিয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে তিনি চোখ মেলিলেন। ভবানী শিয়রের কাছে বসিয়া ছিলেন, গোকুল পদতলে বসিয়া কাঁদিতেছিল। বৈকুণ্ঠ ইঙ্গিতে তাহাকে আরও কাছে আসিতে বলিয়া অত্যন্ত ক্ষীণকণ্ঠে কহিলেন, বিনোদ বুঝি খবর পেলে

না গোকুল ? নইলে সে নিশ্চয় আস্ত। বলিতে বলিতেই তাঁহার .চোখের কোণ বাহিয়া এক ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল। এই কয় দিনের মধ্যে তিনি বিনোদের নাম একটিবারও মুখে আনেন নাই। সহসা শেষ সময়ে ছেলের নাম স্বামীর মুখে শুনিয়া ধিক্কারে, বেদনায় ভবানীর বুক ফাটিয়া গেল, কিন্তু তিনি তেমনি নীরবে অধোমুখে বসিয়া রহিলেন।

গোকুল পিতার চোখ মুছাইয়া দিলে তিনি বলিলেন, চোখে তাকে দেখ্তে পেলুম না, কিন্তু তাকে বলিস্ আমি আশীর্ব্বাদ করে যাচ্চি, একদিন সে ভাল হবে। এমন মায়ের পেটে জন্মে কখনো এ ভাবে চিরকাল কাটাতে পার্বে না। দেখিস বাবা, সেদিন তোর ছোটভাইকে যেন ফেলিস্ নে। আর এই তোমার মা রইলেন—অনেক তপস্যায় তবে এমন মা মেলে গোকুল !

গোকুল শিশুর মত কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, বাবা, আমার মা আমারই রইলেন, কিন্তু বিনোদকে আপনি অৰ্দ্ধেক সম্পত্তি দিয়ে যান।

বৈকুণ্ঠ কহিলেন, না গোকুল, আমার অনেক দুঃখের সম্পত্তি —এ নষ্ট হ'তে দেখ্লে পরকালে বসেও আমার বুকে শেল বাজ্বে। এ আমি কিছুতেই সইতে পারব না। বলিয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ছেলের মুখের পানে চাহিয়া, বোধ করি বা মনে মনে তাঁহার শেষ আশীর্ব্বাদ করিয়া চোখ বুজিলেন। গোকুল পায়ের উপর পড়িয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। বৈকুণ্ঠ ধীরে ধীরে পাশ ফিরিয়া শুইয়া শুধু চুপি চুপি বলিলেন, ছেলেরা রইল ছোটবৌ, আমি এবার চল্লুম।

আর কথা কহিলেন না। এবং পরদিন সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার প্রাণ বাহির হইয়া গেল। তখন অনেকেই অনেক কথা কহিল। বৈকুণ্ঠ পাকা ব্যবসায়ী ছিলেন, কিন্তু খাঁটি লোক ছিলেন। বিশেষতঃ অত্যন্ত দীন অবস্থা হইতে বড় হইতে পারিয়াছিলেন বলিয়া শত্রু মিত্র দুই তাঁর একটু বেশি পরিমাণে ছিল। মিত্রপক্ষের গুণগান অত্যুক্তিকে ছাড়াইয়া গেল। আবার শত্রুপক্ষেরা নিন্দা করিতেও ত্রুটি করিল না। তাহারা কৃপণ বলিয়া, চসম-খোর বলিয়া, বৈকুণ্ঠ মুদীর স্ফীত অঙ্গুলির সহিত কদলীকাণ্ডের উপমা দিয়া বোধ করি বেশ একটু আত্মপ্রসাদ লাভ করিল। তবে এই একটা অতি তুচ্ছ গুণের কথা তাহারাও অস্বীকার করিল না যে, আর যাই হোক্ লোকটা জোচ্চোর বাটপাড় ছিল না। নিজের ন্যায্য পাওনার বেশি কাহাকেও কোন দিন একটি তামার পয়সাও ফাঁকি দেয় নাই। বস্তুতঃ ব্যবসা সম্বন্ধে এই বিদ্যাটিই তিনি বিশেষ করিয়া তাঁর বড়ছেলেকে শিখাইয়া গিয়াছিলেন।

বৈকুণ্ঠ বার বার বলিতেন, গোকুল আমার এই কথাটি কোনদিন ভুলিস্ নে বাবা, যে ঠকিয়ে কখনো মহাজনকে মারা যায় না। তাতে শেষ পর্য্যন্ত নিজেকেই মর্‌তে হয়।

নিজের পলিত মস্তকটা দেখাইয়া বলিতেন, এই মাথাটার উপর দিয়ে অনেক ঝড়বৃষ্টি বয়ে গেছে গোকুল, অনেক দুঃখকষ্ট পেয়েচি, কিন্তু এর জোরে কখনো কারো কাছে মাথা হেঁট করি নি। আমার এই মর্য্যাদাটুকু বজায় রাখিস্ বাবা!

২

৪

বিনোদ বিষয় পায় নাই, কথাটা প্রকাশ পাইবামাত্র পাড়ার দুই-চারিজন গাঁটের পয়সা খরচ করিয়া কলিকাতায় গিয়া খোঁজাখুঁজি সুরু করিয়া দিল। তখন আর কোন কথাই চাপা রহিল না। তাহারা ফিরিয়া আসিয়া বিনোদের ব্যাপার নাম ধাম পরিচয় দিয়া একেবারে প্রকাশ করিয়া দিল। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, অকৃতজ্ঞ গোকুল তাহাদের এই উপকার স্বীকার করিল না। সে রাগের মাথায় একেবারে ফস্‌ করিয়া বলিয়া বসিল, শালারা সব মিথ্যেবাদী। কেবল হিংসে করে এই সব রটাচ্চে।

অতিবৃদ্ধ বাঁড়ুয্যেমশাই লাঠি ঠক্‌ ঠক্‌ করিয়া আসিয়াই একেবারে কাঁদিতে সুরু করিয়া দিলেন। অনেক কষ্টে কান্না থামিলে বলিলেন, গোকুল রে, আমার হারাণ তিনদিন তিনরাত্রি খায় নি শোয় নি, কেবল কলকাতার গলিতে গলিতে ঘুরে বেড়িয়েচে। পঁচিশ-ত্রিশ টাকা খরচ করে তবে সন্ধান পেয়েচে, কোথায় সে ছোঁড়া থাকে। এ ঠিকানা বার করা আর কি কারো সাধ্য ছিল!

গোকুল তিক্ত কণ্ঠে জবাব দিল, আমি ত কাউকে টাকা খরচ করতে সাধি নি মশাই!

বাঁড়ুয্যে অবাক হইয়া কহিলেন, সে কি গোকুল, আমরা যে তোমাদের আপনার লোক! আর সবাই চুপ করে থাকতে পারে, কিন্তু আমরা পারি কৈ?

আচ্ছা, যান যান, আপনারা কাজে যান। বলিয়া গোকুল

নিতান্ত অভদ্রভাবে অন্যত্র চলিয়া গেল। একদিন দুইদিন করিয়া কাটিতে লাগিল, অথচ বিনোদ আসে না। শান্তপ্রকৃতি গোকুল একেবারে উগ্র হইয়া উঠল।

ভবানীকে দেখিলে যেন চেনা যায় না, এই কয়দিনে তাঁহার এমন পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। নীরবে নতমুখে আগামী শ্রাদ্ধের কাজকর্ম্ম করেন—ছেলের নাম মুখেও আনেন না।

এই একটা বৎসর বিনোদ যখন তখন নানা ছলে গোকুলের নিকট টাকা আদায় করিত। তাহার স্ত্রী মনোরমা ব্যাপারটা পূর্ব্বেই অনুমান করিয়া স্বামীকে বারংবার সতর্ক করা সত্ত্বেও সে কান দেয় নাই। এই উল্লেখ আজ সকালে করিবামাত্রই গোকুল আগুন হইয়া কহিল, বিনোদ যখন কারুর বাপের বাড়ির টাকা নষ্ট কর্‌বে, তখন যেন তারা কথা কয়। বলিয়া দ্রুতপদে তাহার বিমাতার ঘরের সুমুখে আসিয়া উচ্চ কণ্ঠে কহিল, অতবড় রাবণ রাজা মেয়েমানুষের পরামর্শে সবংশে ধ্বংস হ'য়ে গেল, তা আমরা কোন্ ছার! কি যে বাবার কানে কানে ফুস্ ফুস্ করে উইল করার মন্তর দিলে মা, সব দিকে আমাকে মাটি করে দিলে।

ভবানী আশ্চর্য্য হইয়া মুখ তুলিবামাত্রই সে হাত পা নাড়িয়া একটা ক্রুদ্ধ ভঙ্গী করিয়া বলিয়া ফেলিল, তোমাকে ভালমানুষ বলেই জান্‌তুম মা, তুমিও কম নয়! মেয়েমানুষের জাতটাই এম্‌নি! বলিয়া তাঁকে 'মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা' দিয়া যেমন করিয়া আসিয়াছিল, তেমনি করিয়া চলিয়া গেল। একে দোকানদার তাহাতে মূর্খ, গোকুলের কথাই এম্‌নি সকলেই

জানিত। বিশেষতঃ রাগিলে আর তাহার মুখের বাধাবাঁধন থাকিত না, ইহাও কাহারো অগোচর ছিল না। কিন্তু তাহার আজকালকার কথাবার্ত্তাগুলো বাড়াবাড়িতে দাঁড়াইতেছে বলিয়া আত্মীয়-পর সকলেরই মনে হইতে লাগিল।

অপরাহ্ণ-বেলায় বাঁড়ুয্যেমশাই দিবানিদ্রা হইতে উঠিয়া হাতমুখ ধুইতেছিল—হঠাৎ গোকুল আসিয়া উপস্থিত হইল। সেদিন অপমান করিলেও ত সে বড়লোক। সুতরাং তাহার আগমনে বৃদ্ধ ব্যস্তসমস্ত হইয়া উঠিলেন। গোকুল তিনখানি নোট ব্রাহ্মণের পায়ের কাছে ধরিয়া দিয়া ম্লানমুখে বিনীত কণ্ঠে বলিল, মাষ্টারমশাই, হারাণের সেদিনকার খরচটা দিতে এলুম।

থাক্ থাক্, সে জন্যে আর ব্যস্ত কেন দাদা, তোমাদের কতই ত খাচ্চি নিচ্চি। বলিয়া বাঁড়ুয্যেমশাই সে নোট তিনখানি তুলিয়া লইলেন। গোকুলের চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল। উত্তরীয়ের প্রান্তে মুছিয়া ফেলিয়া বলিল, কই আজও ত বিনোদ এলো না মাষ্টারমশাই! হারাণকে সঙ্গে করে আমি একবার আজ যাব।

বাঁড়ুয্যেমশাই তীব্রভাবে সর্ব্বাঙ্গ আন্দোলিত করিয়া বলিয়া উঠিলেন, ছি ছি এমন কথা মুখেও এনো না ভাই। সে স্থানে যাবে তুমি, আমার হারাণ থাকতে? না, না, তা হবে না— আমি কালই তাকে পাঠিয়ে দেব।

গোকুল মাথা নাড়িয়া কহিল, না মাষ্টারমশাই, আমি না গেলে হবে না। সে বড় অভিমানী—শুধু উইলের কথা শুনেই অভিমানে আস্‌চে না। আমার মুখ থেকে না শুন্‌লে সে আর

কারো কথাই বিশ্বাস করবে না। বাপ-মায়ে আমার কি সর্ব্বনাশই করলে! বলিয়া গোকুল সহসা আর্ত্তস্বরে কাঁদিয়া ফেলিল। বাঁড়ুয্যেমশাই তাহাকে অনেক প্রকার সান্ত্বনা দিয়া এবং তাহার এ অবস্থায় কোনমতেই সেস্থানে যাওয়া হইতে পারে না বলিয়া, কালই হারাণের দ্বারা তাহাকে আনাইয়া দিবেন, বার বার প্রতিজ্ঞা করিলেন। গোকুল নিরুপায় হইয়া আর পাঁচখানি নোট হারাণের খরচের বাবদ ধরিয়া দিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে বাটী ফিরিয়া গেল।

৫

জয়লাল মাষ্টারকে গোকুল গোপনে আশী টাকা ঘুস দিয়া আসিয়াছে—কথাটা প্রকাশ হওয়া পর্য্যন্ত অনেকেই তাহার নির্ব্বুদ্ধিতা লক্ষ্য করিয়া কটাক্ষ করিয়াছে। সে বিনোদের জন্য ছট্‌ফট্ করিতেছে, অথচ বিনোদ তাহাকে ভ্রূক্ষেপের দ্বারাও গ্রাহ্য করে না—এমন ধারা একটা আভাসও বাড়িসুদ্ধ সকলের চোখে মুখে অনুভব করিয়া গোকুল মনে মনে অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া উঠিতেছিল।

বাড়ির গাড়ী বোধ করি এই লইয়া দশবার চুঁচুড়া ষ্টেসন হইতে ফিরিয়া আসিল। গোকুল তাচ্ছিল্যভরে কোচম্যানকে প্রশ্ন করিল, আর কি কল্‌কাতার গাড়ী নেই যে, তোরা ফিরে এলি? যা, যা, তোরা ফিরো গে যা।

কোচম্যান বিনীতভাবে কহিল, আরো দুখানা আছে বটে, কিন্তু ঘোড়া দানা-পানি পায় নাই বলেই চলে আস্‌তে হ'ল।

গোকুল এক মিনিটেই সপ্তমে চড়িয়া ধম্‌কাইয়া উঠিল, ছোটবাবু মেঠাই-মণ্ডা খায়কে আসতা হ্যায় কিনা, তাই ব্যাটাদের নবাব ঘোড়া একদণ্ড দানা-পানি না পেলেই মরে যাবে। যাও, আভি লে যাও।

কোচম্যান প্রভুর মনের ভাব বুঝিতে না পারিয়া সভয়ে সেলাম করিয়া প্রস্থান করিল।

রসিক চক্রবর্ত্তী বহুদিনের কর্ম্মচারী। এ বাটীতে সকলেই তাহাকে সম্মান করিত। সে কহিল, ছোটবাবু এলে গাড়ী ভাড়া করেও আস্‌তে পার্‌বেন। সেজন্য কেন আপনি ব্যস্ত হচ্চেন বড়বাবু?

রসিক যে নিকটেই ছিল, গোকুল তাহা দেখে নাই। অপ্রতিভ হইয়া কহিল, আমি ব্যস্ত হ'ব সে হতভাগার জন্যে? তুমি বল কি চক্কোত্তিমশাই? বাড়িতে মেয়েরা অমন দিবারাত্রি কান্নাকাটি না কর্‌লে, আমি ত তাকে বাড়ি ঢুকতেই দিই নে। গোকুল মজুমদার রাগ্‌লে বাপের কুপুত্তুর—হ্যাঁ।

রসিকের কিছুই অবিদিত ছিল না। বাটীর মেয়েরা যে বিনোদের অদর্শনে, একটি দিনের জন্যও চোখের জল ফেলে নাই, তাহা সে জানিত। কিন্তু এ লইয়া আর তর্কও করিল না।

সমারোহ করিয়া বাপের শ্রাদ্ধ হইবে। গোকুল সেজন্য বড় ব্যস্ত। কিন্তু কান দুটা তাহার গাড়ীর চাকার দিকেই পড়িয়াছিল। ঘণ্টা-দুই পরে সে বহু দূরে একটা ভারি গাড়ির আওয়াজ পাইয়া রসিক চক্রবর্ত্তীকে শুনাইয়া একটা চাকরকে ডাকিয়া কহিল, ওরে এগিয়ে দেখ ত রে, আমাদের গাড়ী কিনা!

ঘোড়া দুটোকে হয়রাণ করে মারলে বলে রাগ করে দুটো কথা বল্‌লুম, আর বেটারা কি না সত্যি মনে করে গাড়ী নিয়ে ইষ্টিসানে ফিরে গেল! গুণধর ভায়ের জন্য আবার গাড়ী পাঠাতে হবে! সৎমার রাগ হবে বলে ত আর ঘোড়া দুটোকে ফেলা যায় না!

রসিক শুনিতে পাইল, কিন্তু ভাল মন্দ কোন কথাই কহিল না। অনতিকাল পরে খালি গাড়ী ফিরিয়া আসিয়া আস্তাবলে চলিয়া গেল। চাকর আসিয়া সংবাদ দিল। রসিক সম্মুখে ছিল। গোকুল তাহার পানে চাহিয়া কাষ্ঠহাসি হাসিয়া কহিল, তবে ত দুঃখে মরে গেলুম। যা, যা বাড়িতে গিয়ে গিন্নীকে বল্ গে, তার পাশ-করা ছেলের কীর্ত্তি! কাল পরশু এলে যদি তাকে ফটক পার হতে দিই ত তখন তোরা বলিস্—হাঁ, সে ছেলে গোকুল মজুমদার নয়। একবার যখন বেঁকে বসেছি, তখন স্বয়ং ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর এসেও যদি তার হয়ে বলে, তবুও মুখ পাবে না তা বলে দিচ্ছি। তুমি মাকে বলে দাও গে চক্কোত্তিমশাই, পৃথিবী ওলট-পালট হয়ে যাবে, তবু গোকুল মজুমদারের কথার নড়চড় হবে না। সময়ে এলে কিছু পেত; এখন আর একটি পয়সাও না। বাড়ি ঢুকতেই ত তাকে দেব না। বলিয়া গোকুল হন্ হন্ করিয়া ভিতরে চলিয়া গেল।

গোকুল কাহার উপরে ক্রোধ করিয়া যে অসময়ে আসিয়া সন্ধ্যার পরেই শয্যা গ্রহণ করিল, তাহা বাটীর মেয়েরা টের পাইল না। দাসী দুধ খাইবার জন্য অনুরোধ করিতে আসিয়া ধমক্ খাইয়া ফিরিয়া গেল। দোকানের গোমস্তার উপর

অধ্যাপক-বিদায়ের ফর্দ্দ প্রস্তুতের ভার ছিল। সে ঘরে আসিয়া কি-একটা কথা জিজ্ঞাসা করিবামাত্রই গোকুল তড়াক্ করিয়া উঠিয়া কাগজখানা ছিনাইয়া লইয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া কহিল, বাবা দশখানা তালুক রেখে যান নি যে রাজা-রাজড়ার মত পণ্ডিত-বিদায় কর্‌তে হবে! যাও যাও, ওসব আমিরি চাল আমার কাছে খাটবে না।

লোকটা যারপরনাই কুণ্ঠিত ও লজ্জিত হইয়া চলিয়া গেল।

ভবানী জানিতে পারিয়া ঘরের বাহিরে চৌকাটের কাছে আসিয়া বসিলেন। সস্নেহে মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোর কি কোন রকম অসুখ বোধ হচ্ছে গোকুল?

গোকুল যেমন শুইয়া ছিল, তেম্‌নিভাবে জবাব দিল, না।

ভবানী বলিলেন, না, তবে যে কিছু খেলি নে, হঠাৎ এমন সময়ে এসে যে শুয়ে পড়লি?

গোকুল কহিল, পড়লুম।

ভবানী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, অধ্যাপক-বিদায়ের ফর্দ্দটা ছিঁড়ে ফেলে দিলি যে? কাল সকালেই নিমন্ত্রণ-পত্র না পাঠালে আর সময় হবে না বাবা।

গোকুল ঠিক তেম্‌নি করিয়া জবাব দিল, না হয় নাই হবে।

ভবানী কিছু বিস্মিত কিছু বিরক্ত হইয়া কহিলেন, ছি গোকুল, এ-সময়ে ও রকম অধীর হলে ত হবে না। কি হয়েচে আমাকে খুলে বল—আমি সমস্ত ঠিক করে দেব।

মায়ের কথার উত্তরে গোকুল তাহার কম্বলের শয্যা ত্যাগ

করিয়া চোখ পাকাইয়া উঠিয়া বসিল। কাহার সহিত কি ভাবে কথা কহিতে হয়, সে কোন দিন শিক্ষা করে নাই। কর্কশকণ্ঠে কহিল, তোমার যে মতলব শোনে মা, সে একটা গাধা। বাবা তোমার কথা শুন্‌ত বলে কি আমিও শুন্‌ব? আমি দশটি ব্রাহ্মণ খাইয়ে শুদ্ধ হ'ব, কোন জাঁকজমক করব না। বলিয়া সে তৎক্ষণাৎ দেওয়ালের দিকে মুখ করিয়া শুইয়া পড়িল।

ভবানী শান্তস্বরে কহিলেন, ছি বাবা, তিনি স্বর্গে গেছেন—তাঁর সম্বন্ধে কি এমন করে কথা কইতে আছে!

গোকুল জবাব দিল না। তিনি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া পুনরায় কহিলেন, এ রকম কর্‌লে, লোকে কি বল্‌বে বল্‌ দেখি বাছা। যাদের যেমন সঙ্গতি তাদের তেমনি কাজ করতে হয়, না করলেই অখ্যাতি রটে।

গোকুল তেমনিভাবে থাকিয়াই কহিল, রটাক্ গে শালারা। আমি কারো ধার ধারি নি যে, ভয়ে মরে যাব।

ভবানী বলিলেন, কিন্তু তাঁর এতে তৃপ্তি হবে কেন? তিনি যে এত বিষয়-আশয় রেখে গেলেন, তাঁর মত কাজ না কর্‌লে ত তিনি সুখী হবেন না।

ভবানী ইচ্ছা করিয়াই গোকুলের বড় ব্যথার স্থানে ঘা দিলেন। পিতাকে সে যে কি ভালবাসিত, তাহা তিনি জানিতেন।

গোকুল উঠিয়া বসিয়া কাঁদ কাঁদ স্বরে কহিল, খরচের কথা কে বল্‌চে মা। যত ইচ্ছে তোমরা খরচ কর; কিন্তু যত দিন যাচ্চে, ততই যে আমার হাত-পা বন্ধ হয়ে আস্‌চে। বিনোদ

অভিমান করে উদাসীন হয়ে গেল মা, আমি একলা কি করে কি করব? বলিয়া সে অকস্মাৎ উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিয়া উঠিল। ভবানী নিজেও আর সামলাইতে পারিলেন না। কাঁদিয়া ফেলিলেন। অনেকক্ষণ নিঃশব্দে থাকিয়া শেষে আঁচলে চোখ মুছিয়া অশ্রুজড়িত স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, সে কি এ খবর পেয়েছে গোকুল?

গোকুল তৎক্ষণাৎ কহিল, পেয়েছে বই কি মা।

কে তাকে খবর দিল।

কে যে তাহাকে বাড়ির এই দুঃসংবাদ দিয়াছে, গোকুল নিজেও তাহা জানিত না। মাষ্টারমশায়ের পুত্র হারাণের সম্বন্ধে তাহার নিজেরও সন্দেহ জন্মিয়াছিল। তথাপি কেমন করিয়া যেন নিঃসংশয়ে বুঝিয়া বসিয়াছিল—বিনোদ সমস্ত জানিয়া-শুনিয়াই শুধু লজ্জা ও অভিমানেই বাড়ি আসিতেছে না। সে মায়ের মুখপানে চাহিয়া কহিল, খবর সে পেয়েছে মা। বাবা চিরকালের মত চলে গেলেন—এ কি সে টের পায় নি? আমার মত তার বুকের ভেতরেও কি হা হা করে আগুন জ্বলে যাচ্ছে না? সে সব জেনেচে মা, সব জেনেচে।

ভবানী ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া অবশেষে যখন কথা কহিলেন, গোকুল আশ্চর্য্য হইয়া লক্ষ্য করিল—মায়ের সেই অশ্রুগদ্‌গদ্ কণ্ঠস্বর আর নাই। কিন্তু তাহাতে উত্তাপও ছিল না। সহজ কণ্ঠে বলিলেন, গোকুল, তাই যদি সত্যি হয় বাবা, তবে অমন ভায়ের জন্যে তুই আর দুঃখ করিস্ নে। মনে কর্, আমাদের বংশে আর ছেলেপিলে নেই। যে রাগের বশে মরা

বাপ-মায়ের শেষ কাজ করতেও বাড়ি আসে না, তার সঙ্গে আমাদেরও কোন সম্পর্ক নেই।

গোকুল এ অভিযোগের যে কি জবাব দিবে, তাহা ভাবিয়া না পাইয়া, চুপ করিয়া রহিল। কিন্তু জবাব দিল তাহার স্ত্রী। সে দ্বারের আড়ালে বসিয়া সমস্ত আলোচনাই শুনিতেছিল। সেইখান হইতে বেশ স্পষ্ট গলায় কহিল, ঠাকুর কি না বুঝেই এমন একটা কাজ করে গেলেন? তিনি ছিলেন অন্তর্যামী। তিন-চারদিন ধরে কলকাতার বাসায় ঠাকুরপোকে যখন খুঁজে পাওয়া গেল না, তখনই ত তিনি তাঁর গুণগান সব ধরে ফেল্‌লেন। তাঁর বিষয় তিনি যদি সমস্ত দিয়ে যান, তাতে আমাদের কেউ ত আর দোষ দিতে পার্‌বে না। তুমি যাই, তাই ভাই ভাই কর, আর কেউ হ'লে—

টান্‌টা অসমাপ্তই রহিল। আর কেহ কি করিত তাহা খুলিয়া বলা এক্ষেত্রে বড়বৌ বাহুল্য মনে করিল। কিন্তু ভবানী মনে মনে ভয়ানক আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। কারণ ইতিপূর্ব্বে শ্বশুর বর্ত্তমানে বড়বৌ এরূপ কথা কোন দিন বলে নাই; এমন কি শাশুড়ীর সাম্‌নে স্বামীকে লক্ষ্য করিয়া সে কথাই কহে নাই। এই কয়দিনেই তাহার এতখানি উন্নতিতে তিনি নির্ব্বাক হইয়া রহিলেন।

গোকুলও প্রথমটা কেমন-যেন হতবুদ্ধি হইয়া গেল। কিন্তু পরক্ষণেই উন্মুক্ত দরজার দিকে ডান হাত প্রসারিত করিয়া ভবানীর মুখের পানে চাহিয়া একেবারে ক্ষ্যাপার মত চেঁচাইয়া উঠিল, শোন মা, শোন। ছোটলোকের মেয়ের কথা শোন।

প্রত্যুত্তরে বড়বৌ চেঁচাইল না বটে, কিন্তু আরও একটুখানি সবল-কণ্ঠে স্বামীকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, ছ্যাখো, যা বল্‌বে আমাকে বল। খামকা বাপ তুলো না—আমার বাপ তোমার বাপ একই পদার্থ।

জবাব দিবার জন্য গোকুলের ঠোঁট কাঁপিতে লাগিল—কিন্তু কথা ফুটিল না। কিন্তু তাহার দুই চক্ষু দিয়া যেন আগুন বাহির হইতে লাগিল।

ভবানী এতক্ষণ চুপ করিয়াই ছিলেন। এখন মৃদু তিরস্কারের স্বরে বলিলেন, বৌমা, তোমার কথা ক'বার দরকার কি মা! যাও, নিজের কাজে যাও।

বৌমা কহিল, কথা আমি কোন দিনই কই নে মা। দাসী-চাকরের মত খাট্‌তে এসেছি, দিবারাত্রি খেটেই মরি। কিন্তু উনি যে খেতে-শুতে বস্‌তে—আমার চারটে পাশকরা ভাই; আমার পাঁচটা পাশকরা ভাই করে নাপিয়ে বেড়ান; কিন্তু ভাই ত বাড়ি এসে মুখ্যু বলে একটা কথাও কোন দিন কয় না। ওঁর নিজের লজ্জা-সরম থাক্‌লে কি আর কথা বল্‌বার দরকার হয়? বলিয়া সে তিলার্দ্ধ অপেক্ষা না করিয়া গুম্ গুম্ পায়ে অবস্থাটা জানাইয়া দিয়া চলিয়া গেল। তাহার কথা শুনিয়া আজ এতদিন পরে ভবানী স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। এতদিন তিনি তাঁহার বড়বধূটিকে চিনিতে পারেন নাই। এখন চিনিতে পারিয়া তাঁহার দুঃখ, ক্ষোভ ও শঙ্কার আর সীমা-পরিসীমা রহিল না।

কিন্তু বড়বৌ একেবারে চলিয়া যায় নাই। সে বারান্দার

একপ্রান্ত হইতে—কাহারো শুনিতে কিছুমাত্র অসুবিধা না হয় সে দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া পুনরায় বলিল, যখন-তখন শুধু রাশ রাশ টাকা যোগাবার বেলাতেই দাদা। আমার মামাদেরও দু-পাঁচটা পাশ করে বেরুতে দেখচি ত। কিন্তু সাবধান করে দিতে গেলেই তখন বড় তেতো লাগ্‌ত। তা বাবু, তেতোই লাগুক আর মিষ্টিই লাগুক, নিজের টাকা অমন করে অপব্যয় হ'তে থাক্‌লে নিজের ছেলেপিলের মুখ চেয়ে আমি কিছু আর চিরকালটা মুখ বুজে থাক্‌তে পারি নে। মুখ্যু দাদা পেয়েচে, যত পেরেচে, তত ঠকিয়েচে। ঠকাগ, আমার কি? ওর নিজের ছেলেমেয়েই পথে বস্‌বে। বলিয়া বড়বৌ সত্য সত্যই চলিয়া গেল।

গোকুল হাত-পা ছুড়িয়া লাফাইয়া উঠিল। অনুপস্থিত স্ত্রীকে লক্ষ্য করিয়া গর্জ্জন করিতে লাগিল।

কি! আমি মুখ্যু? কোন্ শালা বলে? এ সব বিষয়-সম্পত্তি কর্‌লে কে? আমি না বেন্দা? আমার চোখে ধূলো দিয়ে টাকা আদায় করে নিয়ে যাবে—বেন্দার বাপের সাধ্যি আছে? আমি বড়, সে ছোট। সে চার্‌টে পাশ করে থাকে ত আমি দশটা পাশ কর্‌তে পারি, তা জানিস্? আমি মুখ্যু? বাড়ি ঢুক্‌লে দরওয়ান দিয়ে তাকে দূর করে দেব—দেখি, কে তাকে রাখে!

এমনি অসংলগ্ন এবং নিরর্থক কত-কি সে অবিশ্রান্ত চীৎকার করিতে লাগিল। ভবানী সেই যে নীরব হইয়া ছিলেন, আর কথা কহিলেন না। বহুক্ষণ পর্য্যন্ত একভাবে পাথরের মত বসিয়া থাকিয়া, এক সময়ে ধীরে ধীরে উঠিয়া গেলেন।

৬

তখন ঝগড়া হইল বটে, কিন্তু সেই রাত্রেই যে স্ত্রীর সহিত গোকুলের একটা মিটমাট হইতে বাকী রহিল না, সে তাহার পরদিনের ব্যবহারেই বুঝা গেল। হঠাৎ সকাল হইতেই সে সমস্ত কাজকর্ম্মে হাঁকডাক করিয়া লাগিয়া গেল এবং আগামী কর্ম্মের দিনটি আসিয়া পড়িতে যে মাত্র তিনটি দিন বাকি রহিয়াছে, সেকথা বাড়িসুদ্ধ সকলকে পুনঃ পুনঃ স্মরণ করাইয়া ফিরিতে লাগিল। বাহিরের যে কেহ বিনোদের নাম উত্থাপন করিলেই, আজ সে কানে আঙুল দিয়া বলিতে লাগিল, নিজের বাপ যাকে মৃত্যুকালে ত্যাজ্যপুত্র করে যায়, তার কথা কেউ জিজ্ঞেসা করবেন না। আমাদের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। আমার যে ভাই ছিল, সে মরে গেছে।

তাহার কথা শুনিয়া কেহ চোখ টিপিয়া আর একজনকে ইঙ্গিত করিল, কেহ অলক্ষ্যে ঘাড় নাড়িয়া মনের ভাব প্রকাশ করিল। অর্থাৎ এই সোজা কথাটি কাহারো অবিদিত রহিল না যে, বিনোদ একেবারেই পথে বসিয়াছে এবং গোকুল যে-কোন-কৌশলেই হোক্, ষোলআনাই গ্রাস করিয়াছে। এখন গোপনে অনেকেই বিনোদের জন্য সহানুভূতি প্রকাশ করিতে লাগিল। এমন কি, সে আসিয়া এই ভয়ানক জুয়াচুরির বিরুদ্ধে আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিলে, তাহাদের নিকট সাহায্য পাইতেও পারিবে—এরূপ আভাসও কেহ কেহ দিতে লাগিল। সুবিজ্ঞ জয়লাল বাঁড়ুয্যে স্পষ্টই বলিতে লাগিলেন যে, মানুষকে

যে চিনিতে পারা যায় না, তাহার জীবন্ত প্রমাণ এই গোকুল মজুমদার। শুধু তাঁহার চক্ষেই সে ধূলি প্রক্ষেপ করিতে পারে নাই। কারণ পাড়ার সমস্ত ছেলে-বুড়ো মেয়ে-পুরুষ যখন এক-বাক্যে গোকুলকে ন্যায়নিষ্ঠ ভ্রাতৃবৎসল, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বলিয়া চীৎকারে গগন বিদীর্ণ করিয়াছে, তখন তিনিই শুধু চুপ করিয়া হাসিয়াছেন, আর মনে মনে বলিয়াছেন, আরে, সৎমার ছেলে বৈমাত্র ভাই—তার ওপর এত টান! বেদে পুরাণে যা কস্মিন্‌কালে কখনো ঘটে নি, তাই হবে এই ঘোর কলিকালে। সুতরাং এতদিন তিনি শুধু মুখ বুজিয়া কৌতুক দেখিতেছিলেন, কাহাকেও কোন কথা বলেন নাই। আবশ্যক কি! বেশ জানিতেন একদিন সমস্ত প্রকাশ পাইবেই!

এখন দেখ তোমরা—এই এত ভালো, অত ভালো, গোকুলের সম্বন্ধে যা আমি বরাবর ভেবে এসেচি, ঠিক তাই কি না!

কিন্তু কি এতদিন তিনি ভাবিয়া আসিয়াছিলেন, তাহা কাহারও কখন জানা ছিল না, তখন সকলেই নীরবে তাহার প্রতিজ্ঞা স্বীকার করিয়া লইতে হইল এবং দেখিতে দেখিতে খড়ের আগুনের মত কথাটা মুখে মুখে প্রচার হইয়া গেল। অথচ গোকুল টের পাইল না যে, বাহিরের বিরুদ্ধে আন্দোলন তাহার বিপক্ষে এত সত্বর এরূপ তীব্র হইয়া উঠিল।

ভবানী চিরদিনই অল্প কথা কহিতেন। তাহাতে কাল রাত্রি হইতে ব্যথার ভারে তাহার হৃদয় একেবারেই স্তব্ধ হইয়া গিয়া-ছিল। গোকুলের স্ত্রী মনোরমা এক সময়ে স্বামীকে নির্জ্জনে

ডাকিয়া এই দিকে তার দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়া কহিল, মার ভাব-গতিক দেখচ ?

গোকুল উদ্বিগ্ন হইয়া বলিল, না ! কি হয়েছে মার ?

মনোরমা তাচ্ছিল্যভরে বলিল, হবে আবার কি ! সেই যে কাল বলেছিলুম ঠাকুরপোর টাকা নষ্ট করার কথা—সেই থেকে আমার সঙ্গে কথা কন্ না। তোমার সঙ্গে কথা টথা কইচেন ত !

গোকুল শুষ্ক হইয়া কহিল, না, আমার সঙ্গেও না। মনোরমা ঘাড়টা একটুখানি হেলাইয়া, কণ্ঠস্বর আরও নিচু করিয়া বলিল, দেখলে মজা। যে টাকাগুলো ঠাকুরপো দুহাতে উড়িয়ে দিলে, সেগুলো থাক্‌লে ত আমাদেরই থাক্‌ত। ঠাকুর ত আমাদেরই সব লিখে দিয়ে গেছেন। আমাদের তিনি সর্ব্বনাশ করবেন—আর সে কথা একটু মুখ থেকে খসালেই রাগ করে কথাবার্ত্তা বন্ধ করে দিতে হবে ? এইটে কি ব্যবহার ? তুমি ত 'মা' 'মা' করে অজ্ঞান, তুমিই বল না, সত্যি না মিছে ?

গোকুলের মুখখানা একেবারে কালিবর্ণ হইয়া গেল। কোন-রকম জবাবই সে খুঁজিয়া পাইল না। তাহার স্ত্রী বোধ করি তাহা লক্ষ্য করিয়াই কহিল, ঠাকুরপো যাই করুক তার যাই হোক, সে পেটের ছেলে। তুমি সতীনপো বই নয়। তুমি পেলে সমস্ত বিষয়—এ কি কোন মেয়েমানুষের সহ্য হয় ? না না, আমার সব কথা অমন করে তোমার উড়িয়ে দিলে আর চলবে না ! এখন থেকে তোমাকে একটু সাবধান হতে হবে,

অমন 'মা' 'মা' করে গলে গেলে সব দিকে মাটি হতে হবে, বলে দিচ্ছি! বিষয়সম্পত্তি বড় ভয়ানক জিনিস।

গোকুলের বুকের ভিতরটা অভূতপূর্ব্ব শঙ্কায় গুর্ গুর্ করিয়া উঠিল। সে বিবর্ণমুখে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া শুধু চাহিয়া রহিল। তাহার স্ত্রী কহিল, আমরা মেয়েমানুষ, মেয়েমানুষের মনের ভাব যত বুঝি, তোমরা পুরুষমানুষ, তা পার না। আমার কথাটা শুনো। বলিয়া সে স্বামীর মুখের পানে ক্ষণকাল স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া, কতটা কাজ হইয়াছে অনুমান করিয়া লইয়া বেশ একটু জোর দিয়া বলিল, আর ঠাকুরপো ত চিরদিন এমন-ধারা বয়াটেপানা করে বেড়ালে চলবে না। তাঁকে লেখাপড়া ত তুমি আর কম শেখাও নি। এখন যা হোক্ একটু চাকরি-বাক্রি করে মাকে নিয়ে, বিয়ে-থাওয়া করে সংসারী হতে হবে তাকে। তিনি নিজের মাকে ত সত্যি আর বরাবর আমাদের কাছে ফেলে রাখতে পারবেন না! তা ছাড়া, মাথাগুঁজে দাঁড়াবার যা হোক্ একটু কুঁড়েকাঁড়াও ত করা চাই। তখন আমরাও, যেমন ক্ষমতা সাহায্য কর্ব—লোকে যেন না বলতে পারে, অমুক মজুমদার তার বৈমাত্র ভাইকে দেখলে না। বৈমাত্র ভায়ের সঙ্গে আবার সম্পর্ক কি? যারা বলে তারা বলুক, আমরা সে কথা বল্‌তে পার্‌ব না। সে বংশ আমাদের নয়। বলিয়া সে স্বামীকে ভাবিবার অবকাশ দিয়া অন্যত্র চলিয়া গেল। গোকুল স্বপ্নাবিষ্টের মত শূন্যদৃষ্টিতে চাহিয়া সেইখানে বসিয়া কি সব যেন অদ্ভুত আশ্চর্য্য. স্বপ্ন দেখিতে লাগিল। সব কথা ছাপাইয়া এই একটা কথা তাহার কানের মধ্যে ক্রমাগত

বাজিতে লাগিল—বিষয়-সম্পত্তি বড় ভয়ানক জিনিষ! এবং শুধু সেই জন্যই মা যেন রাগ করিয়া তাহাকে ছাড়িয়া বিনোদের কাছে চিরদিনের জন্য চলিয়া যাইতেছেন। তাহার মনে পড়িল তাহার স্ত্রী মিথ্যা বলে নাই। আজ সারাদিনের মধ্যে মায়ের সহিত তাহার একটা কথাও ত হয় নাই। কার্য্যোপলক্ষে তাঁহার সুমুখ দিয়া সে দু-তিন বার যাতায়াতও করিয়াছে; কিন্তু তিনি মুখ তুলিয়াও ত চাহেন নাই। মা চিরদিনই অত্যন্ত অল্পভাষিণী জানিয়া, সে সময়টায় গোকুলের কিছুই মনে হয় নাই বটে, কিন্তু এখন সে সমস্ত ব্যাপারটা ঠিক যেন জলের মতই স্পষ্ট দেখিতে লাগিল। অথচ এই সমস্ত চুপচাপ নীরব বিরুদ্ধতা সহ্য করাও তাহার পক্ষে একেবারে অসম্ভব। সে তৎক্ষণাৎ উঠিয়া মার সহিত মুখোমুখি কলহ করিবার জন্য দ্রুতপদে তাঁহার ঘরে গিয়া প্রবেশ করিল। ঢুকিয়াই বলিল, এমনধারা মুখভার করে কাজ-কর্ম্মের বাড়িতে বসে থাক্‌লে ত চল্‌বে না মা।

ভবানী বিস্ময়াপন্ন হইয়া মুখ তুলিয়া চাহিবামাত্রই গোকুল বলিয়া উঠিল, তোমার বৌ ত আর মিছে বলে নি যে, বিনোদ রাশ রাশ টাকা নষ্ট কর্‌চে! বাবা তার বিষয় যদি আমাকে দিয়ে যান, তাতে আমার দোষ কি? তুমি তার সঙ্গে বোঝাপড়া কর গে, আমাদের উপর রাগ করতে পারবে না, তা বলে দিচ্চি।

ভবানী মর্ম্মাহত হইয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, আমি কারো ওপরে রাগ করি নি গোকুল, কারো সঙ্গে বোঝাপড়া কর্‌তে চাই নে।

যদি চাও না ত ওরকম করে থাক্‌লে চলবে না। বিনোদকে ব'ল সে যেন চাক্‌রি-বাক্‌রি করে। আমার বাড়ীতে তার যায়গা হবে না।

সে ত হবেই না গোকুল, এ আর বেশি কথা কি! বলিয়া ভবানী মুখ নিচু করিয়া বসিয়া রহিলেন।

ঝগড়া করিতে না পাইয়া গোকুল নিরুপায়-ক্রোধে বিড় বিড় করিয়া বকিতে বকিতে চলিয়া গেল। স্ত্রীকে ডাকিয়া কহিল, আজ স্পষ্ট বলে দিলুম মাকে—বিনোদের এখানে আর থাকা হবে না—চাক্‌রি-বাক্‌রি ক'রে যা ইচ্ছে করুক আমি কিছু জানি নে।

মনোরমা আহ্লাদে আগাইয়া আসিয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি বল্‌লেন উনি?

গোকুল অস্বাভাবিক উত্তেজনার সহিত জবাব দিল, বল্‌বেন আবার কি! আমি বলাবলির কি ধার ধারি!

বড়বৌ চোখ ঘুরাইয়া কহিল, তবু, তবু?

গোকুল তেমনি করিয়াই কহিল, তবু আর কি! তাঁকে স্বীকার কর্‌তে হ'লো যে—না বিনোদের এ বাড়ীতে থাকা চলবে না।

তাহার স্ত্রী গলা আরো খাটো করিয়া কহিল, এ ষোল আনা রাগের কথা, তা বুঝেছ? মার মন পড়ে রয়েচে নিজের ছেলেটির পানে—এখন তুমি হয়েচ তাঁর দুচক্ষের বালি।

গোকুল ঘাড় নাড়িয়া বলিল, তা আর বুঝি নি? আমার কাছে কি চালাকি চলে?

বাহিরে আসিয়াই রসিক চক্রবর্ত্তীকে সুমুখে পাইয়া কহিল, বলি একটা নতুন খবর শুনেচ চক্কোত্তিমশাই? এতকাল এত ক'রে এখন আমিই হয়েচি মার দুচক্ষের বিষ। কথাবার্ত্তা আর আমাদের সঙ্গে কন না; সুমুখে পড়লে মুখ ফিরিয়ে বসেন।

চক্রবর্ত্তী অকৃত্রিম বিস্ময় প্রকাশ করিয়া কহিল, না না, বল কি বড়বাবু?

কি বলি? ওরে ও হাবুর মা, শোন্ শোন্!

বাড়ির বুড়া ঝি কি কাজে বাহিরে যাইতেছিল; মনিবের ডাকাডাকিতে কাছে আসিবামাত্র গোকুল চক্রবর্ত্তীর প্রতি চাহিয়া কহিল, একে জিজ্ঞেস করে দেখ।—কি বলিস্ হাবুর মা, মাকে আমার সঙ্গে কথা কইতে আর দেখেচিস্? সুমুখে পড়লে বরং মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন ত?

হাবুর মা কিছুই জানিত না। সে মূঢ়ের মত ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া, অবশেষে একটু ঘাড় নাড়িয়া মনিবের মন রাখিয়া নিজের কাজে চলিয়া গেল।

সত্যি মিথ্যে শুনলে ত? বলিয়া চক্রবর্ত্তীর প্রতি একটা ইসারা করিয়া গোকুল অন্যত্র চলিয়া গেল।

সেদিন পাড়ার যে কেহ দেখা-শুনা করিতে আসিল, তাহারই কাছে সে বিমাতার বিরুদ্ধে নালিশ করিয়া, পুনঃ পুনঃ এই একটা কথাই বলিয়া বেড়াইতে লাগিল, আমি সতীনপো বই ত নয়! কাজেই বাবা মরতে-না-মরতেই দুচক্ষের বিষ হয়ে দাঁড়িয়েচি।

সন্ধ্যার সময় বাড়ির ভিতরে আসিয়া ভবানীকে লক্ষ্য

করিয়া বলিল, আমার এত দায় পড়ে যায় নি যে, লোকজন পাঠিয়ে বর্দ্ধমান থেকে ছোটপিসিমাদের আন্‌তে যাব। এত গরজ নেই—আস্‌তে হয়, তিনি নিজে আস্‌বেন।

ভবানী মুখ তুলিয়া মৃদুকণ্ঠে কহিলেন, সেটা কি ভাল কাজ হবে গোকুল ?

গোকুল তীব্রকণ্ঠে বলিল, ভাল মন্দ জানি নে। দুহাতে টাকা ওড়াবার আমার সাধ্যি নেই। তুমি এ নিয়ে আমাকে আর জেদ ক'র না, তা বলে দিচ্চি।

ইঁহাদিগকে আনাইবার জন্য ভবানীই কাল গোকুলকে আদেশ করিয়াছিলেন। এখন আর কিছু বলিলেন না। চুপ করিয়া হাতের কাজে মন দিলেন। তথাপি গোকুল স্বমুখে পায়চারি করিতে করিতে বলিতে লাগিল, আনো বল্‌লেই ত আর আন্‌তে পারি নে মা। ধারকর্জ্জ করে ত আমি ডুবে যেতে পার্‌ব না।

ভবানী অস্ফুট স্বরে বলিলেন, বেশ ত গোকুল, ভাল বোঝো—নাই বা সেখানে লোক পাঠালে!

গোকুল বলিতে বলিতে চলিয়া গেল, এখন থেকে আমাকে বুঝতেই হবে যে! আমার কি আর আপনার মা আছে! আমি মলেই বা কার কি—কে আর আমার আছে! এখন নিজেকে নিজে সামলানো চাই। টাকা-কড়ি বুঝে-সুঝে খরচ করা দরকার! নিজের মা ত নেই! বলিয়া সে চলিয়া গেল। তাহার টাকা-কড়ি বিষয়-সম্পত্তিতে অকস্মাৎ এত বড় আসক্তি দেখিয়া ভবানী নিঃশব্দে নিশ্বাস ফেলিলেন। কিন্তু গোকুল

তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া আসিয়া কহিল, আমি কি বুঝি নে? এটা তোমার রাগের কথা নয়। কাল নিজে তুমি বল্‌লে, গোকুল, তোর পিসিমাদের লোক পাঠিয়ে আনা, আর আজ বল্‌চ, যা ভাল হয় তাই কর্? আমার বাপ নেই, ভাই নেই বলে, আমাকে এম্‌নি করে জব্দ করা? লোকে বল্‌বে গোকুল বুঝি সত্যি সত্যিই তার মায়ের কথা শোনে না!

তাহার এই একান্ত অবোধ্য অভিযোগে ভবানী বিমূঢ় হতবুদ্ধির মত এক মুহূর্ত্ত তাহার পানে চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, গোকুল, আমি ত তোদের কিছুতেই নেই—কোন কথাই ত বলি নি বাবা।

গোকুল অকস্মাৎ দুইচক্ষু অশ্রুপূর্ণ করিয়া কহিল, তোমার কোন্ হুকুমটা শুনি নে মা, যে তুমি আমাকে এম্‌নি করে বল্‌চ? কিন্তু ভাল হবে না, তা বলে দিচ্ছি। বেন্দা লজ্জায় ঘেন্নায় বাড়ি-ছাড়া হয়ে গেল—আমারও যেখানে দুচক্ষু যায় চলে যাব। থাক তুমি তোমার বিষয়-আশয় নিয়ে। বলিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল।

৭

গোকুলের বড়মেয়ে হেমাঙ্গিনী তাহার ঠাকুরমার কাছে শুইত। সে ভোর হইতে-না-হইতে চেঁচাইতে চেঁচাইতে আসিল, কাকা এসেছে মা, কাকা এসেছে।

পাশের ঘরে গোকুল শুইয়া ছিল। সে ধড়ফড় করিয়া

কম্বলের শয্যার উপর উঠিয়া বসিল। শুনিতে পাইল, তাহার স্ত্রী নিরানন্দ-বিস্ময়ের সহিত প্রশ্ন করিতেছে, কখন এল রে তোর কাকা ?

মেয়ে কহিল, অনেক রাত্তিরে মা।

মা জিজ্ঞাসা করিল, এখন কি কচ্চে ?

মেয়ে কহিল, এখনও উঠেন নি। তিনি নিজের ঘরে ঘুমিয়ে আছেন।

তাহার মা আর কোন প্রশ্ন না করিয়া কাজে চলিয়া গেল। গোকুল দরজা হইতে গলা বাড়াইয়া হাত নাড়িয়া মেয়েকে কাছে ডাকিয়া কহিল, তোর ঠাকুরমা তাকে কি বল্‌লে রে হিমু ?

হিমু ঘাড় নাড়িয়া বলিল, জানি নে ত বাবা।

গোকুল তথাপি প্রশ্ন করিল, খুব বক্‌লে বুঝি রে ?

হিমু অনিশ্চিতভাবে বার-দুই মাথা নাড়িয়া অবশেষে কি মনে করিয়া বলিল, হুঁ।

গোকুল ব্যগ্র হইয়া তাহার একটা হাত ধরিয়া একেবারে ঘরের মধ্যে টানিয়া লইয়া গিয়া আস্তে আস্তে কহিল, তোর ঠাকুরমা কি কি সব বল্‌লে—বল্ ত মা হিমু !

হিমু বিপদে পড়িল। কাকা যখন আসেন, তখন সে ঘুমাইতেছিল—কিছুই জানিত না। বলিল, জানি নে ত বাবা !

গোকুল বিশ্বাস করিল না। অপ্রসন্ন হইয়া বলিল, এই যে বল্‌লি জানিস্। মা তোকে মানা করে দিয়েচে, না ? আমি কাউকে বল্‌ব না রে, তুই বল্ না।

জেরায় পড়িয়া হিমু ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিল। গোকুল তাহার মাথায় মুখে হাত বুলাইয়া উৎসাহ দিয়া কহিল, বল্ ত মা, কি কি কথা হ'ল? মা বুঝি বল্‌লে, বেরিয়ে যা তুই বাড়ি থেকে? এই নে দুটো টাকা নে—পুতুল কিনিস। বলিয়া সে বালিশের তলা হইতে টাকা লইয়া মেয়ের হাতে গুঁজিয়া দিল।

হিমু শুষ্ক হইয়া বলিল, হুঁ, বল্‌লে!

তার পর? তার পর?

হিমু কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিল, তার পরে ত জানি নে বাবা।

গোকুল পুনরায় তাহার মুখে মাথায় হাত বুলাইয়া দিয়া কহিল, জানিস্ বৈ কি! তোর কাকা কি বল্‌লে?

কিচ্ছু বল্‌লে না।

গোকুল বিশ্বাস করিল না। বিরক্ত ও কঠিন হইয়া প্রশ্ন করিল, একেবারে কিছুই বল্‌লে না? তা কি হয়?

পিতার ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর লক্ষ্য করিয়া হিমু প্রায় কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল, জানি নে ত বাবা।

ফের্ জানিস্ নে? হারামজাদা মেয়ে? বলিয়া সে চটাস্ করিয়া মেয়ের গালে চড় কষাইয়া ঠেলিয়া দিয়া বলিল, যা, দূর হ।

মেয়ে কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গেল।

গোকুল দ্রুতপদে নিচে নামিয়া তাহার বিমাতার ঘরে ঢুকিয়া বলিল, তা বেশ করেচ! সে বাড়ি ঢুকতে না ঢুকতেই নানারকম করে নাগিয়েচ, ভাঙিয়েচ—আমার ওপর যাতে তার মন ভেঙে

যায়—এই ত? সে সব কিছু আমার আর শুনতে বাকি নেই। কিন্তু তোমার ছেলেকেও সাবধান করে দিয়ো—আমার সুমুখে না পড়ে; তা বলে দিয়ে যাচ্চি! বলিয়াই তেম্‌নি দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল। ভবানী কিছুই বুঝিতে না পারিয়া অবাক্‌ হইয়া চাহিয়া রহিলেন। বাহিরে নানা লোক নানা কাজে ব্যস্ত ছিল। সে খানিকক্ষণ এদিক-সেদিক করিয়া হাবুর মাকে ডাকাইয়া আনিয়া কহিল, ও হাবুর মা, বলি ভায়া যে বাড়ি এসেচেন, শুনেচিস্‌।

ঝি ঘাড় নাড়িয়া কহিল, হাঁ বাবু, ঘোর রাত্তিরে ছোটবাবু বাড়ি এলেন।

গোকুল কহিল, সে ত জানি রে! তার পরে মায়ে-ব্যাটায় কি কি কথা হ'ল? আমার নামে বুঝি মা খুব ক'রে লাগালে? বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবার-টাবার কথা—

ঝি বাধা দিয়া কহিল, না বড়বাবু, মা ত ওঠেন নি। যদু তাঁর ব্যাগটা নিয়ে এলে, আমি ছোটবাবুর ঘর খুলে আলো জ্বেলে দিলুম। তিনি সেই যে ঢুক্‌লেন আর ত বার হন নি।

গোকুল অপ্রত্যয় করিয়া কহিল, কেন ঢাক্‌চিস্‌ ঝি? আমি যে সব শুনেচি।

গোকুলের কথা শুনিয়া ঝি বিস্ময়ে ক্ষণকাল চাহিয়া রহিল। তারপরে হাবুর দিব্যি করিয়া বলিল, অমন কথাটি ব'ল না বড়বাবু। আমি সব্বোক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে ছোটবাবুর কাজকর্ম্ম করে দিলুম। তিনি মাকে ডাক্‌তে নিষেধ করে বল্‌লেন, ঝি,

আর আমার কিছু দরকার নেই। তুই শুধু আলোটা জ্বেলে দিয়ে শুগে যা। আহা! চোখ মুখ বসে গিয়ে একেবারে কালিবর্ণ হয়ে গেছে। গোকুলের চোখ দুটি ছল ছল করিয়া উঠিল। কহিল, তা আর হবে না? তুই বলিস্ কি হাবুর মা, বাবা মারা গেলেন, ছোঁড়া একবার চোখের দেখাটা দেখতে পেলে না—একটা পয়সার বিষয়-আশয় পর্য্যন্ত পেলে না—তার মনে মনে যা হচ্ছে, তা সেই জানে! বাবাকে সে কি ভালই বাস্‌ত, তা তোরা সব জানিস্? কি বলিস্ হাবুর মা? বলিতে বলিতেই গোকুলের চোখের কোণে জল আসিয়া পড়িল। হাবুর মা অনেক দিনের দাসী। চোখের জল দেখিয়া তাহার চোখেও জল আসিল। গাঢ়স্বরে কহিল, তা আর বল্‌তে বড়বাবু! তেনার বাবা-অন্ত প্রাণ ছিল যে! তবে কি না বড় বড় লেখাপড়া কর্‌তে কর্‌তে মগজটা কেমনধারা যে গরম হয়ে গেল—তাই—

গোকুল হাবুর মাকে একেবারে পাইয়া বসিল। কহিল, তাই বল্ না হাবুর মা! মগজটা গরম হবে না? বিদ্যেটা কি সে কম শিখেচে! অনার গ্রাজুয়েট্! বলি, এই হুগলি-চুঁচড়ো-বাবুগঞ্জে কটা লোক আমার ভায়ের মত বিদ্যে শিখেচে—কই দেখিয়ে দে দেখি? লাটসাহেব নিজে এসে যে তাকে হাত ধরে বসায়—সে কি একটা হেজি-পেজি মানুষ! তুই ত ঝি, কিন্তু কল্‌কাতায় গিয়ে কোন ভদ্দরলোককে বল্ গে দেখি যে, তুই বিনোদবাবুদের বাড়ির দাসী! তোকে ডেকে নিয়ে বসিয়ে হাজারটা খবর নেবে, তা জানিস্? কিন্তু ঐ যে কথায় বলে গাঁয়ের যুগী ভিক্ষে পায় না! এখানকার কোন ব্যাটা কি তারে

চিন্‌তে পার্‌লে? মুখখানি একেবারে শুকিয়ে গেছে দেখলি না রে?

ঝি ঘাড় নাড়িয়া বলিল, মুখখানি দেখলে চোখে আর জল রাখা যায় না বড়বাবু!

গোকুলের চোখ দিয়া দর্ দর্ করিয়া জল গড়াইয়া পড়িল। উত্তরীয় অঞ্চলে অশ্রু মুছিয়া কহিল, তুই তাকে মানুষ করেছিস্ হাবুর মা, তুই শুধু তাকে চিন্‌তে পেরেছিস্। আহা! চিরটা কাল তার হেসে-খেলে আমোদ-আহ্লাদ করে লেখা-পড়া নিয়েই কেটেচে। কবে এ সব হাঙ্গামা তাকে পোয়াতে হয়েছে, বল্ দেখি! আর উইল করে বিষয় দেব না বল্‌লেই দেব না! তার বাপের বিষয় নয়? কোন্ শালা আট্‌কায়? কি করেচে সে? চুরি করেচে, ডাকাতি করেচে? খুন করেচে? কোন শালা দেখেচে? তবে কেন বিষয় পাবে না বল্ দেখি শুনি? আইন-আদালত নেই? বিনোদ নালিশ কর্‌লে আমাকে যে বাবা বলে অর্দ্ধেক বিষয় কড়ায়-গণ্ডায় তাকে চুল চিরে ভাগ করে দিতে হবে তা জানিস্।

ঝি সায় দিয়া বলিল, তা দিতে হবে বৈ কি বাবু।

গোকুল উৎসাহে চোখ-মুখ উদ্দীপ্ত করিয়া কহিল, তবে তাই বল্ না! আর এই মা-টা! তুই মেয়েমানুষ, মেয়েমানুষের মত থাক্ না কেন? তুই কেন উইল করার মৎলব দিতে গেলি? এইটে কি তোর মায়ের মত কাজ হ'ল? ধর্ম্ম নেই? তিনি দেখচেন না? নির্দ্দোষকে কষ্ট দিলে—তাঁর কাছে তোকে জবাব দিতে হবে না? আর বিষয়! ভারি বিষয়—আজ-বাদে-কাল

সে যখন হাইকোর্টের জজ্ হবে—সে ত আর কেউ তার আট-কাতে পারবে না—তখন কি করে রাখবি বিষয় ? এ সব ভেবে-চিন্তে কাজ করতে হবে না ! এখন স-মানে না দিলে তখন অপমান হয়ে দিতে হবে যে !

হাবুর মা খুসি হইয়া উঠিল। সে বিনোদকে মানুষ করিয়াছিল—এই সমস্ত উইল-টুইল তাহার একেবারে ভালই লাগে নাই ; কহিল, আচ্ছা বড়বাবু, তুমি তাই কেন ছোটবাবুকে ডেকে বল না যে, তোর বিষয়-আশয় ভাই তুই নে। তুমি দিলে ত আর কারু না বলবার যো নেই।

কিন্তু এইখানেই ছিল গোকুলের আসল খট্‌কা। সে খানিকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া কহিল, তবে সবাই যে বলে, আমার দেবার সাধ্যি নেই। বাবার উইল ত রদ্ করতে পারি নে হাবুর মা। আমাদের বড়বৌর মামাত ভাই একজন মস্ত মোক্তার—সে নাকি তার বোনকে চিঠি লিখেছে, তা হলে জেল খাট্‌তে হবে। তবে যদি মা রাজী হয়, বড়বৌ রাজী হয়, তখন বটে।

হাবুর মা ইহার সদুত্তর দিতে না পারিয়া তাহার কাজে চলিয়া গেল।

গোকুল মুখ ফিরাইতেই দেখিল, হিমু খেলা করিতে যাইতেছে। তাহাকে আদর করিয়া কাছে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তোর কাকা উঠেছে রে ?

হিমু ঘাড় কাত করিয়া কহিল, হুঁ, উঠেই তাঁর বস্‌বার ঘরে চলে গেলেন—কারু সঙ্গে কথা কইলেন না।

বাটীর একান্তে পথের ধারের একটা ঘরে বিনোদ বসিত।

ঘরখানি ইংরাজি-ধরণে সাজান ছিল—এইখানেই তার বন্ধু-বান্ধবেরা দেখা-সাক্ষাৎ করিতে আসিত। গোকুল পা টিপিয়া কাছে গিয়া জানালার ভিতর দিয়া চাহিয়া দেখিল, বিনোদ চৌকিতে না বসিয়া নিচে মেজের উপর ওদিকে মুখ করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছে। তাহার এই বসিবার ধরণ দেখিয়াই গোকুলের দুটি চক্ষু জলে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। সে নীরবে দাঁড়াইয়া ছোটভায়ের মুখখানি দেখিবার আশায় মিনিট পাঁচ-ছয় অপেক্ষা করিয়া শেষে চোখ মুছিয়া ফিরিয়া আসিল।

চক্রবর্ত্তী কহিল, বড়বাবু, অধ্যাপক বিদায়ের ফর্দ্দটা—

গোকুল সহসা যেন অন্ধকারে আলোর রেখা দেখিতে পাইল। তাড়াতাড়ি কহিল, এ সব বিষয়ে আমাকে আর কেন জড়ান চক্কোত্তিমশাই। মা সরস্বতী ত স্বয়ং এসে পড়েচেন। কে কেমন পণ্ডিত, কার কত মান-মর্য্যাদা বিনোদের কাছে ত চাপা নেই—তাকেই জিজ্ঞাসা করে ঠিক করে নাও না কেন? আমি এর মধ্যে আর হাত দেব না চক্কোত্তিমশাই।

চক্রবর্ত্তী কহিল, কিন্তু ছোটবাবু ত এখনো ঘুম থেকে উঠেন নি।

গোকুল ম্লানভাবে একটুখানি হাসিয়া কহিল, ঘুম থেকে। তার কি আহার নিদ্রা আছে? হাবুর মাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করে দেখ—যে স্বচক্ষে দেখেচে। বলে বড়বাবু, ছোটবাবুর মুখের পানে চাইলেই আর চোখে জল রাখা যায় না—এমনি চেহারা হয়েচে। ভেবে ভেবে সোনার বর্ণ যেন কালিমারা হয়ে গেছে। বলিয়া তাহার বসিবার ঘরটা ইঙ্গিতে দেখাইয়া দিয়া বলিল,

গিয়ে দেখ গে—সে ঠাণ্ডা মাটীর উপর একলাটি চুপ করে বসে আছে। সে দেখলে কার না বুক ফেটে যায়, বল ত চক্কোত্তিমশাই ?

চক্রবর্ত্তী দুঃখসূচক কি-একটা কথা অস্ফুটে কহিয়া ফর্দ্দ লইয়া যাইতেছিল ; গোকুল তাহাকে ফিরাইয়া ডাকিয়া কহিল, আচ্ছা, তুমি ত সমস্তই জান—তাই জিজ্ঞাসা করি, আমি থাক্‌তে বিনোদকে আর এত কষ্ট দেওয়া কেন ? উপোস-তিরেশ কি ওর ওই রোগা দেহতে সহ্য হবে ? হয় ত বা অসুখ হয়ে পড়বে। আমি বলি—খাওয়া-শোওয়া ওর যেমন অভ্যাস তেম্‌নি চলুক।

চক্রবর্ত্তী নিরুৎসাহভাবে কহিল, না পার্‌লে—

কথাটা গোকুল শেষ করিতেই দিল না। বলিল, পার্‌বে কি করে, তুমিই বল দেখি ? আমাদের এ সব কুলি-মজুরের দেহ—এতে সব সয়। কিন্তু ওর ত তা নয়। পাঁচ-সাতটা পাশ করে যে দেশের মাথার মণি হয়েচে, তার দেহতে আর আমার দেহতে তুমি তুলনা করে বস্‌লে ? কে আছিস্ রে ওখানে—ভূতো ? যা ত একবার চট্ করে আমাদের ভশ্চায্যিমশাইকে ডেকে আন্। না হয় যত টাকা লাগে—শ্রাদ্ধের সময় আমি মূল্য ধরে দেব। তা বলে ত মায়ের পেটের ভাইকে মেরে ফেল্‌তে পার্‌ব না। ওকে আমি আলো-চালের হবিষ্যি করিয়ে নিকেশ কর্‌তে পার্‌ব না, এতে তিনি যাই বলুন।

চক্রবর্ত্তী অত্যন্ত অপ্রতিভ হইয়া সায় দিয়া কহিল, সে ত ঠিক কথা বড়বাবু। তবে কিনা লোকে বল্‌বে—

আর লোকে কি বল্‌বে বলে কি নিজের ভাইটাকে মেরে ফেল্‌ব ? তোমার এ সব কি বুদ্ধি হ'ল, বল ত চক্কোত্তিমশাই ? না না, ফৰ্দ্দ-টৰ্দ্দ নিয়ে তোমার এখন তাকে জ্বালাতন করবার দরকার নেই। মুখে যা হোক্ একটু কিছু দিয়ে আগে সে সুস্থ হোক্। বলিয়া গোকুল নিতান্ত অকারণেই সে বেচারার উপর রাগ করিয়া চলিয়া গেল।

৮

চায়ের বাটিটা বিনোদ ব্রাহ্মণের হাত হইতে লইয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। কিন্তু সে বস্তুটা যে কত গোপনে প্রস্তুত হইয়াছিল এবং পাত্রটা যে কাহার বুকের উপর গিয়া কতখানি আঘাত করিল, সে শুধু অন্তর্যামীই দেখিলেন।

সমস্ত দিনের মধ্যে বিনোদ অনেকেরই সহিত কিছু কিছু কথাবার্ত্তা কহিল বটে, কিন্তু বড়ভাইয়ের ছায়া দেখিলেও সে সরিয়া যাইতে লাগিল। অথচ সে ছায়াও তাহাকে মুহূর্ত্তের অবকাশ দেয় না। বিনোদ যেদিকে মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যায়, গোকুল কাজের ঝঞ্চাটে হঠাৎ সেই দিকেই আসিয়া পড়ে। এম্‌নি করিয়া বেলা পড়িয়া আসিল।

অপরাহ্ণ-বেলায় বিনোদ বসিবার ঘরে একা বসিয়াছিল, একখানা কাগজ হাতে করিয়া গোকুল আসিয়া দাঁড়াইল। অকারণে খানিকটা কাষ্ঠ-হাসি হাসিয়া কহিল, কলকাতার বাসা

ছেড়ে তুমি হাজারিবাগে হঠাৎ চলে গেলে—বাবা মৃত্যুকালে—সে শুনেচ বোধ হয়—সে একটা তামাসা আর কি! বলিয়া গোকুল পুনরায় শুষ্ক হাসির অভিনয় করিয়া কহিল, তা তোমার যেমন কাণ্ড, একটা খবর পর্য্যন্ত দেওয়া নেই; তা যাক্, সে সব হবে অখন—কাজটা চুকে যাক্—একটা দানপত্র লিখলেই—বুঝলে না বিনোদ—গোটা-কয়েক টাকা শুধু বাজে খরচ হয়ে যাবে—বুঝলে না—আর শালার লোক যা এখানকার—জানই ত সব—বুঝলে না ভাই—তা সে কিছুই না—বাবাও বলে গেলেন বিষয় আশয় তোমাদের দুই ভাইয়ের রইল, এ একটা শুধু বুঝলে না—তা যাক্—সে জন্য কিছুই আটকাবে না—আর আমার ত মেজাজের ঠিক নেই ভাই। এই লোহার সিন্ধুকের চাবিটা তুমি রাখ। আবার পণ্ডিতদের আহ্বান করা হয়েচে, কার কত বিদায়, কে কি দরের লোক, সে তুমি ঠিক করে না দিলে ত আর কেউ পার্‌বে না। কিন্তু আমার ত এমন ফুরসুৎ নেই যে, দাঁড়িয়ে দুদণ্ড তোমার সঙ্গে দুটো পরামর্শ করি। বলিয়া গোকুল চাবিটা এবং কাগজখানা কোনমতে সুমুখে ধরিয়া দিয়া তাড়াতাড়ি প্রস্থানের উপক্রম করিল। ঘুম ভাঙিয়া অবধি এই কথাগুলাই সে মনে মনে মক্স করিতেছিল। বিনোদ হাত দিয়া সেগুলো ঠেলিয়া দিয়া কহিল, আমাকে এর মধ্যে আপনি জড়াবেন না—এ সব আমি ছোঁবো না।

এক মুহূর্ত্তেই গোকুলের দাঁতের হাসি পাথরের মত জমাট বাঁধিয়া গেল। তাহার সারাদিনের জল্পনা-কল্পনা ব্যর্থ হইবার উপক্রম করিল। কহিল, ছোঁবে না? কেন?

বিনোদ কহিল, আমার আবশ্যক কি? আমি বাইরের লোক, দুদিনের জন্য এসেছি—দুদিন পরেই চলে যাব।

গোকুল কহিল, চলে যাবে?

বিনোদ বলিল, যেতেই ত হবে! তা ছাড়া এ সব টাকা-কড়ির ব্যাপার। আমি দীন-দুঃখী, হিসাব মিলিয়ে দিতে না পারলে চোর বলে তখন আপনিই হয় ত আমাকে পুলিশের হাতে দিয়ে জেল খাটিয়ে ছাড়বেন।

জবাব দিবার জন্য গোকুলের ঠোঁট দুটা একবার কাঁপিয়া উঠিল মাত্র। তার পর হেঁট হইয়া চাবি এবং কাগজটা তুলিয়া লইয়া বাহির হইয়া গেল। পিতৃশ্রাদ্ধে জাঁক-জমক করিয়া নাম কিনিবার ইচ্ছা তাহার মনের ভিতর হইতে মরীচিকার মত মিলাইয়া গেল।

অথচ আজ সকাল হইতেই তাহার উৎসাহ এবং চেঁচামেচির বিরাম ছিল না। সহসা সন্ধ্যার পরেই সে আসিয়া যখন তাহার কম্বলের শয্যাশ্রয় করিয়া শুইয়া পড়িল, তাহার স্ত্রী ঘরে ঢুকিয়া অতিশয় বিস্মিত হইল।

তোমার কি অসুখ করচে?

গোকুল উদাসভাবে কহিল, না, বেশ আছি।

তবে, অমন করে শুলে যে?

গোকুল জবাব দিল না। মনোরমা পুনরায় প্রশ্ন করিল, ঠাকুরপোর সঙ্গে কথা-টথা কিছু হ'ল?

গোকুল কহিল, না।

তখন বড়বধূ অদূরে মেঝের উপর বেশ করিয়া আসন গ্রহণ

করিয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিল, ঠাকুরপো কি বলে বেড়াচ্চে শুনেচ।

গোকুল মৌন হইয়া রহিল। মনোরমা তখন আরও একটু ঘেঁসিয়া আসিয়া কহিল, বলে, বাবার ব্যামোশ্যামো কিছুই জানি নে, হাজারিবাগ না কোথায়—কত ফন্দিই জানে তোমার এই ভাইটি!

গোকুল নিরীহভাবে প্রশ্ন করিল, ফন্দি কেন? তুমি বিশ্বাস কর না?

মনোরমা বলিল, আমি? আমি ন্যাকা? একগলা গঙ্গাজলে দাঁড়িয়ে বল্লেও করি নে।

কথাটা গোকুলের অত্যন্ত বিশ্রী লাগিল। তাহার এই অসাধারণ চারটে পাশ-করা কুলপ্রদীপ ভাইটির বিরুদ্ধে কেহ কোন কথা বলিলেই সে চটিয়া উঠিত। কিন্তু আজ নাকি তাহার বুক-জোড়া ব্যথায় সমস্ত দেহ অবসন্ন হইয়া গিয়াছিল, তাই সে চুপ করিয়াই রহিল। ঘরে প্রদীপ ছিল বটে, কিন্তু সে আলোক তেমন উজ্জ্বল ছিল না—মনোরমা তাহার স্বামীর মুখের ভাবটা ঠিক লক্ষ্য করিতে পারিল না; বলিয়া উঠিল, খুব সাবধান, খুব সাবধান! এখন অনেক রকম ফন্দি-ফিকির হতে থাক্‌বে—কিছুতে কান দিয়ো না। বাবাকে জিজ্ঞাসা না করে একটি কাজও কর্‌তে যেয়ো না যেন। কাল সকালের গাড়ীতেই তিনি এসে পড়বেন—আমি অনেক করে চিঠি লিখে দিয়েচি। যাই বল, বাবা না এলে আমার কিছুতে ভয় ঘুচবে না।

গোকুল উঠিয়া বলিল, তোমার বাবা কি আস্‌বেন?

আস্‌বেন না? তিনি না এলে এ সময়ে সাম্‌লাবে কে? নিমতলার কুণ্ডুদের আড়তের বাবাই হলেন সর্ব্বেসর্ব্বা। কিন্তু তা বলে এমন বিপদে মেয়ে-জামাইকে তিনি ত ফেলে দিতে পারবেন না!

গোকুল চুপ করিয়া শুনিতে লাগিল। মনোরমা অত্যন্ত খুসি এবং ততোধিক উৎসাহিত হইয়া বলিতে লাগিল, তোমার দোকান-পত্র যা কিছু ফেলে দাও বাবার ঘাড়ে। আর কি কাউকে কিছু দেখতে হবে? শুধু বল্‌বে, আমি জানি নে, বাবা জানেন। ব্যস্‌! তখন ঠাকুরপোই বল, আর যেই বল, কারু সাধ্যি হবে না যে তাঁর কাছে দাঁত ফোটাবেন। বুঝলে না? বলিয়া মনোরমা একান্ত অর্থপূর্ণ একটা কটাক্ষ করিল। ম্লান আলোকে গোকুল তাহা দেখিতে পাইল কি না; বলা যায় না; কিন্তু সে হাঁ-না কোন কথাই কহিল না। তাহার পরেও অনেক ভাল ভাল কথা বলিয়াও মনোরমা যখন আর স্বামীর নিকট হইতে কোন সাড়াই পাইল না, তখন বাতাসটা যে কোন্‌ মুখো বহিতেছে, তাহা ঠাহর করিতে না পারিয়া সে সে-রাত্রির মত ক্ষান্ত দিল। সকালবেলা গোকুল অতিশয় ব্যস্তভাবে ভবানীর ঘরের সুমুখে আসিয়া কহিল, মা, লোহার সিন্ধুকের চাবিটা কি বিনোদ তোমার কাছে রেখে গেছে?

ভবানী সংক্ষেপে বলিলেন, কই না।

চাবিটা গোকুলের নিজের কাছেই ছিল। কিন্তু সে মনে মনে অনেক মৎলব করিয়াই এই মিথ্যাটা আসিয়া কহিয়াছিল। ভাবিয়াছিল, এমন জিনিসটা বিনোদের হাতে দেওয়া সম্বন্ধে মা

নিশ্চয়ই ব্যস্ত হইয়া উঠিবেন। কিন্তু মায়ের এই সংক্ষিপ্ত উত্তরের মুখে তাহার সমস্ত কৌশলই ভাসিয়া গেল। তখন সে ম্লানমুখে আস্তে আস্তে কহিল, কি জানি, সে-ই কোথায় রাখলে, না আমিই কোথায় ফেল্‌লুম!

ভবানী কোন কথাই কহিলেন না। এই ভিড়ের বাড়িতে সিন্ধুকের চাবির উদ্দেশ পাওয়া যাইতেছে না, এ সংবাদেও মা যখন কিছুমাত্র উদ্বেগ প্রকাশ করিলেন না এবং এই তাঁহার একান্ত নির্লিপ্ততা গোকুলের বুকে যে কি শূল বিঁধিল, তাহাও যখন তিনি চোখ তুলিয়া একবার দেখিলেন না, তখন সে যে কি বলিবে, কি করিয়া মাকে সংসার সম্বন্ধে সচেতন করিয়া তুলিবে, তাহার কোন কূলকিনারাই চোখে দেখিতে পাইল না। খানিকক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া কহিল, শম্ভু আর দরবারী পিসিমাদের যে আন্‌তে গেল, কই তারাও ত এখনো এসে পড়ল না!

ভবানী মৃদুকণ্ঠে কহিলেন, কি জানি, বল্‌তে পারি নে ত।

গোকুল বলিল, ভাগ্যে লোক পাঠাতে তুমি বলেছিলে মা। এখন না আসেন, তাঁদের ইচ্ছে। কিন্তু আমরা ত দোষ থেকে খালাস হয়ে গেলুম। তুমি যে কতদূর ভেবে কাজ কর মা, তাই শুধু আমি আশ্চর্য্য হয়ে ভাবি। তুমি না থাকলে আমাদের—

ভবানী চুপ করিয়া রহিলেন। গোকুলের মুখের এমন কথাটাতেও তাঁহার গম্ভীর বিষণ্ণ মুখে সন্তোষ বা আনন্দের লেশমাত্র দীপ্তি প্রকাশ পাইল না। গোকুল অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত

সেইখানে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া শেষে ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

বাহিরে আসিয়াই গোকুল শশব্যস্ত হইয়া উঠিল। ইতিমধ্যে জেলার নূতন ডেপুটি এবং কয়েকজন উকিল-মোক্তার নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন এবং বিনোদ তাঁহাদের পার্শ্বে বসিয়া মৃদুকণ্ঠে কথাবার্ত্তা কহিতেছে।

এই সমস্ত বিশিষ্ট ভদ্রলোকদিগের কাছে ছোটভায়ের পরিচয়টা কোন সুযোগে দিয়া ফেলিবার জন্য গোকুল একেবারে ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল। অথচ বিনোদের সমক্ষে তাহারই চারটে পাশ করার খবর দিবার উপায় ছিল না—সে তাহাতে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিত।

সে খানিকক্ষণ এদিক-ওদিক করিয়া হাকিমের সুমুখে আসিয়া একেবারে মাথা ঝুঁকাইয়া সেলাম করিল এবং একান্ত বিনয়ের সহিত কহিল, এটি আমার ছোটভাই বিনোদ—অনার গ্রাজুয়েট।

বিনোদ ক্রুদ্ধ-কটাক্ষে বড়ভায়ের মুখের প্রতি চাহিল; কিন্তু গোকুল ভ্রূক্ষেপও করিল না; কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিল, আমার সাতপুরুষের ভাগ্য যে আপনি এসেচেন—বিনোদ, হাকিমের সঙ্গে ইংরিজিতে আলাপ ক'চ্চ না কেন? ওঁরা হাকিম, হুজুর; ওঁদের কি বাঙলায় কথা কওয়া সাজে? পাঁচজনে শুন্‌লেই বা তোমাকে বল্‌বে কি?

আশেপাশের ভদ্রলোকেরা মুখ তুলিয়া চাহিল। ডেপুটিবাবু সঙ্কুচিত ও কুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন এবং অসহ্য লজ্জায় বিনোদের

সমস্ত চোখমুখ রাঙা হইয়া উঠিল। দাদার স্বভাব সে ভালমতেই জানিত। সুতরাং নিরস্ত করিতে না পারিলে দাদা যে কোথায় গিয়া দাঁড়াইবেন, তাহার কোন হিসাব-নিকাশই ছিল না।

একটা কথা শুনুন, বলিয়া সে একরকম জোর করিয়াই হাত ধরিয়া গোকুলকে একপাশে টানিয়া লইয়া কহিল, দাদা, আমাকে কি আপনি এক্ষুণি বাড়ি থেকে তাড়াতে চান? এরকম করলে আমি ত একদণ্ডও টিক্‌তে পারি নে।

গোকুল ভীত হইয়া কহিল, কেন? কেন ভাই?

কতদিন বলেচি আপনার এ অত্যাচার আমি সহ্য করতে পারি নে; তবু কি আপনি আমাকে রেহাই দেবেন না? আমার মতন পাশ-করা লোক গলিতে গলিতে ঘুরে বেড়াচ্চে যে! বলিয়া বিনোদ ক্ষোভে অভিমানে মুখখানা বিকৃত করিয়া স্বস্থানে ফিরিয়া আসিল।

গোকুল লজ্জায় এতটুকু হইয়া অন্যত্র চলিয়া গেল। বোধ করি বলিতে বলিতে গেল, এরূপ কর্ম্ম সে আর করিবে না। অথচ আধ ঘণ্টা পরে বিনোদ এবং বোধ করি উপস্থিত অনেকের কানে গেল—গোকুল চীৎকার করিয়া একটা ভৃত্যকে সাবধান করিয়া দিতেছে—ছোটবাবুর অনার গ্রাজুয়েটের সোনার মেডেলটা যেন সকলে হাতে করিয়া, ঘাঁটাঘাঁটি করিয়া নোংরা করিয়া না ফেলে।

ডেপুটিবাবু একটুখানি মুচকিয়া হাসিয়া বিনোদের মুখের প্রতি চাহিয়া অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া লইলেন।

৯

নিমতলার কুণ্ডুদের আড়ত কানা করিয়া গোকুলের শ্বশুর আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পাকা চুল, কাঁচা গোঁফ, বেঁটে আঁটসাঁট গড়ন। অত্যন্ত পাকা লোক। আড়তের ছোঁড়ারা আড়ালে বলিত, বাস্তুঘুঘু। শ্রাদ্ধবাটীতে এক মুহূর্ত্তেই তিনি কর্ম্মকর্ত্তা হইয়া উঠিলেন এবং ঘণ্টা-খানেকের মধ্যেই পাড়াশুদ্ধ সকলের সঙ্গে আলাপ করিয়া ফেলিলেন। এই কর্ম্মদক্ষ হিসাবী শ্বশুরকে পাইয়া গোকুল উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। আত্মীয় বান্ধবেরা সবাই শুনিল, মেয়ে-জামাইয়ের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া, তিনি ব্যবসা হাতে লইবার জন্য দয়া করিয়া আসিয়াছেন।

রাত্রি একপ্রহর হইয়াছে, খাওয়ান-দাওয়ানও প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, চাকর আসিয়া সংবাদ দিল, কর্ত্তাবাবু আহ্বান করিয়াছেন। গোকুল সসম্ভ্রমে ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল। শ্বশুরমশাই—নিমাই রায়, বহুমূল্য কার্পেটের আসনে বসিয়া দৌহিত্রীকে সঙ্গে লইয়া জলযোগে বসিয়াছেন, অদূরে কন্যা মনোরমা মাথার আঁচলটা অম্‌নি একটু টানিয়া দিয়া, সৎ-শাশুড়ীর আসল পরিচয়টা চুপি চুপি পিতৃসকাশে গোচর করিতেছে, এমনি সময়ে গোকুল আসিয়া দাঁড়াইল।

শ্বশুরমশাই ক্ষীরের বাটিটা এক চুমুকে নিঃশেষ করিয়া, বাটির কানায় গোঁফটা মুছিয়া লইয়া চোখ তুলিয়া কহিলেন,

বাবাজী, একটি প্রশ্ন করি তোমাকে! বলি হাতের ঢিল আর মুখের কথা একবার ফস্‌কে গেলে কি আর ফেরানো যায়?

গোকুল হতবুদ্ধি হইয়া কহিল, আজ্ঞে না।

নিমাই কন্যার প্রতি চাহিয়া একটু স্নিগ্ধ গম্ভীর হাস্য করিয়া জামাতাকে কহিলেন, তবে?

এই 'তবে'র উত্তর জামাতা কিন্তু আকাশ পাতাল খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিল না, চুপ করিয়া রহিল। নিমাই ভূমিকাটি ধীরে ধীরে জমাট করিয়া তুলিতে লাগিলেন; কহিলেন, বাবাজী, তোমরা ছেলেমানুষ দুটিতে যে কান্নাকাটি করে আমাকে এই তুফানে হাল ধর্‌তে ডেকে আন্‌লে—তা হাল আমি ধর্‌তে পারি, ধর্‌বও; কিন্তু তোমাদের ত ছট্‌ফট্‌ কর্‌লে চল্‌বে না বাবা। যেখানে বস্‌তে বল্‌ব, যেখানে দাঁড়াতে বল্‌ব, ঠিক তেমনি করে থাকা চাই তবেই ত এই সমুদ্রে পাড়ি জমাতে পার্‌ব। বিনোদ বাবাজী হাজারীবাগে ছিলেন, এই যে সব এলোমেলো কথা যাকে তাকে বলে বেড়াচ্চ এটা কি হচ্চে? এ যে নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মারা হচ্চে, সেটা কি বিবেচ্য কর্‌তে পার্‌চ না?

পিতার বক্তৃতা শুনিয়া কন্যা আহ্লাদে গদ্‌গদ হইয়া, ফিস্‌ ফিস্‌ করিয়া বলিতে লাগিল, হচ্চেই ত বাবা। তাইতে ত তোমাকে আমরা ডেকে এনেছি। আমরা কিছু জানি নে—তুমি যা বল্‌বে, যা কর্‌বে, তাই হবে। আমরা জিজ্ঞেসা পর্য্যন্ত কর্‌ব না, তুমি কি কর্‌চ না কর্‌চ।

পিতা খুসী হইয়া কহিলেন, এই ত আমি চাই মা! মাম্‌লা ।মকদ্দমা অতি ভয়ানক জিনিস। শোন নি মা, লোকে গাল দেয় 'তোর ঘরে মাম্‌লা ঢুকুক'। সেই মাম্‌লা এখন তোমাদের ঘরে। আমাদের নাকি বড় পাকা মাথা, তাই সাহস কর্‌চি, তোমাদের আমি কিনারায় টেনে তুলে দিয়ে তবে যাব—এতে আমার নিজের যাই হোক্‌! একটি একটি করে তাঁদের গলা টিপে বার কর্‌ব, তবে আমার নাম বদ্দিপাড়ার নিমাই রায়। বলিয়া তিনি মুখের ভাবটা এমন ধারাই করিলেন যে, ওয়াটার্‌লুর লড়াই জিতিয়া ওয়েলিংটনের মুখেও বোধ করি অত বড় গর্ব্ব প্রকাশ পায় নাই। গলা বাড়াইয়া দ্বারের বাহিরে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, মা মনু, এইখানেই আমার হাতে একটু জল দে, মুখটা ধুয়ে ফেলি; আর বাইরে যাব না। আর অম্‌নি একটু বেরিয়ে দেখ মা, কেউ কোথাও কান পেতে টেতে আছে কি না। বলা যায় না ত—এ হ'ল শত্রুর পুরী।

মনোরমা যথানির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য সমাপন করিয়া স্বস্থানে ফিরিয়া আসিয়া উপবেশন করিল। গোকুল বিহ্বল বিবর্ণ মুখে একবার স্ত্রীর প্রতি, একবার শ্বশুরের প্রতি চাহিতে লাগিল। এতক্ষণ ধরিয়া পিতাপুত্রীতে যত কথা হইল, তাহার একটা বর্ণও বুঝিতে পারিল না। এ কাহাদের কথা, কাহার ঘরে মাম্‌লা ঢুকিল, কাহাকে গলা টিপিয়া কে বাহির করিতে চায়, কাহার কি সর্ব্বনাশ হইল —প্রভৃতি ইসারা ইঙ্গিতের বিন্দুমাত্র তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে না পারিয়া, একেবারে আড়ষ্ট হইয়া উঠিল। নিমাই কহিলেন,

দাঁড়িয়ে রইলে কেন বাবাজী, একটু স্থির হয়ে ব'স—দুটো কথাবার্ত্তা হয়ে যাক্।

গোকুল সেইখানে বসিয়া পড়িল। তিনি বলিতে লাগিলেন, এই তোমাদের সুসময়। যা করে নিতে পার বাবা, এই বেলা। কিন্তু একটা সর্ব্বনেশে মকদ্দমা যে বাধ্‌বে, সেও চোখের উপরই দেখ্‌তে পাচ্চি। তা বাধুক, আমি তাতে ভয় খাই নে—সে জানে হাটখোলার যদু উকিল আর তারিণী মোক্তার। বদ্দি-পাড়ার নিমাই রায়ের নাম শুন্‌লে বড় বড় উকিল ব্যারিষ্টার কৌঁসুলির মুখ শুকিয়ে যায়—তা এ তো এক ফোঁটা ছোঁড়া—না হয় দুপাত ইংরিজিই পড়েছে।

গোকুল আর থাকিতে না পারিয়া সভয়ে সবিনয়ে প্রশ্ন করিল, আপনি কার কথা বল্‌চেন! কাদের মকদ্দমা?

এবার অবাক্ হইবার পালা—বদ্দিপাড়ার নিমাই রায়ের। প্রশ্ন শুনিয়া তিনি গভীর বিস্ময়ে গোকুলের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন।

মনোরমা ব্যাকুল হইয়া সজোরে বলিয়া উঠিল, দেখ্‌লে বাবা, যা বলেছি তাই। জিজ্ঞাসা করচেন কার মকদ্দমা! তোমার দিব্যি করে বল্‌চি বাবা, এঁর মত সোজা মানুষ আর ভূ-ভারতে নেই। এঁকে যে ঠাকুরপো ঠকিয়ে সর্ব্বস্ব নেবে, সে কি বেশি কথা? তুমি এসেচ, এই যা ভরসা, নইলে সোম-বচ্ছরের মধ্যে দেখ্‌তে পেতে বাবা, তোমার নাতি-নাত্‌কুড়েরা রাস্তায় দাঁড়িয়েচে।

নিমাই নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, তাই বটে। তা যাক্,

আর সে ভয় নেই—আমি এসে পড়েচি। কিন্তু তোমাদের আড়তের ঐ সব চক্কোত্তি-ফকোত্তিকে আমি আগে তাড়াব। ওরা সব হচ্চে—বরের মাসি কনের পিসি, বুঝলে না মা! ভেতরে ভেতরে যদি না ওরা তোমার বিনোদের দলে যোগ দেয় ত আমার নামই নিমাই রায় নয়। লোকের ছায়া দেখলে তার মনের কথা বল্‌তে পারি। বলিয়া নিমাই একবার গোকুলের প্রতি, একবার কন্যার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন।

কন্যা তৎক্ষণাৎ সম্মতি দিয়া কহিল, এখ্‌খুনি এখ্‌খুনি। আমি আর জানি নে বাবা, সব জানি। জেনে-শুনেও বোকা হয়ে বসে আছি। তোমার যাকে খুসি রাখ, যাকে খুসি তাড়াও, আমরা কথাটি ক'ব না।

এতক্ষণে গোকুল সমস্তটা বুঝিতে পারিল। তাহার ছোট-ভাই বিনোদ তাহারই বিরুদ্ধে মকদ্দমা করিতে ষড়যন্ত্র করিতেছে। অথচ ইহারা যখন তাহার সমস্ত অভিসন্ধিই বুঝিয়া ফেলিয়াছে, সে শুধু নির্ব্বোধের মত সেই ছোটভাইকে প্রসন্ন করিবার জন্য ক্রমাগত তাহার পিছনে পিছনে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে! প্রথমটা তাহার ক্রোধের বহ্নি যেন তাহার ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল; কিন্তু ঐ একটি মুহূর্ত্ত মাত্র। পরক্ষণেই সমস্ত নিবিয়া গিয়া, নিদারুণ অন্ধকারে তাহার দৃষ্টি, তাহার বুদ্ধি, তাহার চৈতন্যকে পর্য্যন্ত যেন বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলিল। তাহার দুই কানের মধ্যে কত লোক যেন ক্রমাগত চীৎকার করিতে লাগিল—বিনোদ তাহার নামে আদালতে নালিশ করিয়াছে।

নিমাই কহিলেন, টাকার দিকে চাইলে হবে না বাবাজী,

সাক্ষীদের হাত করা চাই। তাঁদের মুখেই মকদ্দমা। বুঝলে না বাবাজী।

গোকুল মাথা ঝুঁকাইয়া কাঠের মত বসিয়া রহিল, বুঝিল কি না, তাহার জবাব দিল না। বোধ করি কথাটা তাহার কানেও যায় নাই।

কিন্তু তাহার কন্যার কানে গিয়াছিল। সে ঢালা হুকুমও দিল, অবশ্য কন্যা এবং জামাতা একই পদার্থ এবং অন্যান্য বিষয়ে তাঁর কথাতেই কাজ চলিতে পারে বটে; কিন্তু এই সাক্ষীর বাবদে গোপনে টাকা খরচ করিবার অবারিত হুকুমটা জামাতা বাবাজীর মুখ হইতে ঠিক না পাইয়া রায় মহাশয়ের উৎসাহের প্রাখর্য্যটা যেন ঝিমা পড়িয়া গেল। বলিলেন, আচ্ছা সে সব পরামর্শ কাল-পরশু একদিন ধীরে সুস্থে হবে অখন। আজ যাও বাবাজী; হাতমুখ ধুয়ে কিছু জলটল খাও, সারাদিন—

কথাটা শেষ হইবার পূর্ব্বেই গোকুল হঠাৎ উঠিয়া নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেল। রায় মহাশয় মেয়ের দিকে চাহিয়া কহিলেন, বাবাজী ত কথাই কইলে না! টাকা ছাড়া কি মামলা মকদ্দমা করা যায়? বিপক্ষের সাক্ষী ভাঙিয়ে নেওয়া কি শুধু হাতে হয় রে বাপু! ভয় করলে চল্‌বে কেন?

নিমাই পাকা লোক। মানুষের ছায়া দেখিলে তার মনের ভাব টের পান। সুতরাং গোকুলের এই নিরুদ্যম স্তব্ধতা শুধু যে টাকা খরচের ভয়েই, তাহা বুঝিয়া লইতে তাঁহার বিন্দুমাত্র সময় লাগে নাই, কিন্তু তাই বলিয়া মেয়ের এই ঘোর বিপদের দিনেও ত তিনি আর অভিমান করিয়া দূরে থাকিতে পারেন

না। বিনা হিসাবে অর্থব্যয় করিবার গুরুভার তাঁর মত আপনার লোক ছাড়া কে আর মাথায় লইতে আসিবে ? কাজেই নিজের যতই কেন ক্ষতি হোক না, এমন কি কুণ্ডুদের আঁড়তের কাজটা গেলেও তাঁর পশ্চাৎপদ হইবার জো নাই। লোকে শুনিলে যে গায়ে থুথু দিবে। গোকুল চলিয়া গেলে, এমনি অনেক প্রকারের কথায়, অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত তিনি তাঁর বিপদ-গ্রস্ত কন্যাকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন।

১৩

সামান্য কারণেই গোকুলের চোখ রাঙা হইয়া উঠিত। তাহাতে সারা রাত্রি জাগিয়া সকাল-বেলা যখন সে তাহার ঘরে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন সেই একান্ত রুক্ষ মূর্ত্তি দেখিয়া ভবানী ভীত হইলেন। গোকুল ঘরে পা দিয়া কহিল, ওঃ—সৎমা যে কেমন তা জানা গেল।

একে ত এই কথাটা সে আজকাল পুনঃ পুনঃ কহিতেছে ; তাহাতে ও অন্যান্য নানা প্রকারে উত্যক্ত হইয়া ভবানীর নিজের স্বাভাবিক মাধুর্য্য নষ্ট হইয়া আসিতেছিল। কিন্তু বাহিরের লোক, আত্মীয় কুটুম্বেরা তখনও নাকি বাটীতে ছিল, তাই তিনি কোনমতে আপনাকে সংযত করিয়া সংক্ষেপে কহিলেন, কি হয়েচে ?

গোকুল লাফাইয়া উঠিল। কহিল, হবে কি ? কি কর্‌তে পার তোমরা ? বেন্দা নালিশ করে কিছু কর্‌তে পার্‌বে না তা

বলে দিয়ে যাচ্চি—এদিকে ঈশের মূল আছে। নিমাই রায়—বদ্দিপাড়ার নিমাই রায়, সোজা লোক নয়, তা জেনে রেখ।

ভবানী ক্রোধ ভুলিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, বিনোদ নালিশ কর্‌বে, এ কথা তোমাকে কে বল্‌লে ?

গোকুল কহিল, সবাই বল্‌লে। কে না জানে যে, বিনোদ আমার নামে নালিশ করবে ?

ভবানী বলিলেন, কই আমি ত জানি নে।

আচ্ছা, জান কি না, সে আমরা দেখে নিচ্চি! বলিয়া গোকুল সক্রোধে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছিল, কিন্তু ফিরিয়া দাঁড়াইতেই সহসা তাহার শ্বশুরের কথাটাই মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল, তোমাদের মত শত্রুদের আমি ত আর বাড়িতে রাখতে পারি নে!

কিন্তু কথাটার সঙ্গে সঙ্গে তাহার রুদ্রমূর্ত্তি ভয়ে বিবর্ণ এবং ক্ষুদ্র হইয়া গেল। কিন্তু ব্যাধের আকৃষ্ট ধনুর সম্মুখ হইতে ভয়ার্ত্ত মৃগ যেমন করিয়া দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া ছুটিয়া পলায়, গোকুলও ঠিক তেমনিভাবে মায়ের সুমুখ হইতে সবেগে পলায়ন করিল। সে যে কি কথা বলিয়া ফেলিয়াছে, তাহা সে জানে; তাই সেদিন সমস্ত দিবা-রাত্রির মধ্যে কোথাও তাহার সাড়া শব্দ পর্য্যন্ত পাওয়া গেল না। কুটুম্ব-ভোজনের সময়েও সে উপস্থিত রহিল না। ভবানী প্রশ্ন করিয়া জানিলেন, বড়বাবু জরুরি তাগাদায় বাহির হইয়া গিয়াছেন; কখন আসিবেন কাহাকেও বলিয়া যান নাই। নিমাই রায় কর্ম্মকর্ত্তা সাজিয়া আদর-আপ্যায়ন কাহাকেও কম করিলেন না। বাহিরের নিমন্ত্রিত যে

কয়জন আসিয়াছিলেন, বিনোদ তাঁহাদের সঙ্গে বসিয়া নিঃশব্দে ভোজন করিয়া উঠিয়া গেল।

ঝড়ের পূর্ব্বে নিরানন্দ প্রকৃতি যেরূপ স্তব্ধ হইয়া বিরাজ করে, অনেক লোকজন সত্ত্বেও সমস্ত বাড়িটা সেইরূপ অশুভ ভাব ধরিয়া রহিল। বিশেষ কোন হেতু না জানিয়াও, চাকর-দাসীরা কেমন যেন কুণ্ঠিত ত্রস্ত হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। এমনি করিয়া আরও দুদিন কাটিল। যাঁহারা শ্রাদ্ধোপলক্ষে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা একে একে বিদায় লইলেন। পিসিমা তাঁর ছেলে-মেয়ে লইয়া বর্দ্ধমানে চলিয়া গেলেন। বিনোদ তাহার বাহিরে বসিবার ঘরে বসিয়াই, সকাল হইতে সন্ধ্যা কাটাইয়া দেয়—কাহারো সহিত বাক্যালাপ করে না। ভিতরে ভবানী একেবারেই নির্ব্বাক হইয়া গিয়াছেন। গোকুল পলাইয়া পলাইয়া বেড়ায়—ভিতরে বাহিরে কোথাও তাহার সাড়া পাওয়া যায় না—এমনভাবেও তিন-চারি দিন অতিবাহিত হইল। মনোরমা এবং তাঁহার পুত্র-কন্যা ছাড়া এ-বাড়িতে আর যেন কোন মানুষই নাই।

নিমাই রায় তাঁহার কলিকাতার সম্পর্ক চুকাইয়া দিবার জন্য গিয়াছিলেন; সেদিন সকাল-বেলা, বোধ করি বা কুণ্ডুদের অকূল পাথারে ভাসাইয়া দিয়াই, মেয়ে-জামাইকে কূলে তুলিবার জন্য ফিরিয়া আসিলেন। আজ সঙ্গে তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্রটিও আসিয়াছিল। আগমনের হেতুটা যদিচ তখনও পরিষ্কার হয় নাই, কিন্তু সে যে তাহার ভগিনী ও ভগিনীপতিকে শুধু দেখিবার জন্যই ব্যাকুল হইয়া আসে নাই, সেটুকু বুঝা গিয়াছিল। এ কয়দিন

অতি প্রাজ্ঞ শ্বশুরের সবল উৎসাহের অভাবে গোকুল যেরূপ ম্রিয়মান হইয়াছিল, আজ তাহারও সে ভাব ছিল না। মনোরমার ত' কথাই নাই! সকাল হইতে সমস্ত বাড়িটা সে যেন চষিয়া বেড়াইতে লাগিল। খাওয়া-দাওয়ার পর মনোরমার ঘরের মধ্যেই ইঁহাদের বৈঠক বসিল। এবং অল্পকালের বাদানুবাদেই সমস্ত স্থির হইয়া গেল। আজ চক্রবর্ত্তীর তলব হইয়াছিল। তাহাকে বিদায় দিবার পূর্ব্বে সমস্ত কাগজপত্র নিমাই তন্ন তন্ন করিয়া বুঝিয়া লইতে লাগিলেন। একান্ত পীড়িত ও উদ্‌ভ্রান্ত চিত্তে সে বেচারা না পারে সব কথার জবাব দিতে, না পারে ঠিক মত হিসাব বুঝাইতে। ক্রমাগতই সে ধমক খাইতেছিল এবং বাপ-ব্যাটার কড়া জেরার চোটে, সে যে একজন পাকা চোর ইহাই নিজেকে প্রতিপন্ন করিতেছিল।

নিমাই কহিলেন, আমি ছিলাম না, তাই অনেক টাকাই তুমি আমার খেয়েচ, কিন্তু আর না, যাও তোমাকে জবাব দিলুম।

চক্রবর্ত্তীর দুই চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল; কহিল, বাবু, আমি আজকের চাকর নই, কর্ত্তামশাই আমাকে জানতেন।

গোকুল ঘাড় হেঁট করিয়া রহিল। রায় মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র মুখ খিঁচাইয়া কহিল, তোমার কর্ত্তামশায়ের মত কি বাবাকে গরু পেয়েচ, হ্যা? আর মায়া বাড়াতে হবে না; সরে পড়ো।

এই নাবালক শ্যালকের একান্ত অভদ্র তিরস্কারে ব্যথিত হইয়া চক্রবর্ত্তী চোখ মুছিয়া ফেলিল এবং ক্ষণকাল মৌন

থাকিয়া গোকুলকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, বাবু আমার চার মাসেই মাইনে—

গোকুল তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, সে ত আছেই চকোত্তি-মশাই, আরও যদি—কথাটা শেষ হইল না। নিমাই ডান হাত প্রসারিত করিয়া গোকুলকে থামাইয়া দিয়া জলদগম্ভীর স্বরে কহিলেন, তুমি থাম না বাবাজী।

চক্রবর্ত্তীকে কহিলেন, বাবু উনি নয়, বাবু আমি! আমি যা করব, তাই হবে। মাইনে তুমি পাবে না। তোমাকে যে জেলে দিচ্চি নে, এই তোমার বাপের ভাগ্যি বলে মানো!

চক্রবর্ত্তী দ্বিরুক্তি না করিয়া উঠিয়া গেল।

মনোরমা এতক্ষণ কথা কহিতে না পাইয়া ফুলিতেছিল। সে যাইবামাত্রই মুখখানা গম্ভীর করিয়া স্বামীকে লক্ষ্য করিয়া কণ্ঠস্বরে আব্দার মাখাইয়া দিয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া কহিল, ফের যদি তুমি বাবার কথায় কথা কবে—আমি হয় গলায় দড়ি দিয়ে মরব, না হয় সব্বাইকে নিয়ে বাপের বাড়ি চলে যাব।

গোকুল জবাব দিল না, নতমুখে নিঃশব্দে বসিয়া রহিল। পিতা ও ভ্রাতার সম্মুখে স্বামীর এই একান্ত বাধ্যতায়, সুখে, গর্ব্বে গলিয়া গিয়া মনোরমা আধ আধ স্বরে কহিল, আচ্ছা বাবা, আমাদের নন্দলালকে কেন দোকানের একটা কাজে লাগিয়ে দাও না?

নিমাই বলিলেন, তাই ত ছোঁড়াটাকে সঙ্গে আনলুম মা। আমি ত আর বেশি দিন এখানে থাকতে পারব না; আমাদের নিজেদের চালানি কাজটা তা হ'লে বন্ধ হয়ে যাবে। আমার

কি আস্‌বার যো ছিল মা, বাবুর সঙ্গে ঝগড়া করে চলে এসেচি। তিনি প্রায় কাঁদ কাঁদ হয়ে বললেন, রায়মশাই, তুমি না ফিরে আসা পর্য্যন্ত আমার আহার নিদ্রা বন্ধ হয়ে থাকবে। দিবা-রাত্রি তোমার পথ চেয়ে বসেই আমার দিন যাবে। তাই মনে কর্‌চি, মা, আমার নন্দত্বলালকেই দেখিয়ে শুনিয়ে, শিখিয়ে পড়িয়ে যাব! আর যাই হোক, ও আমারি ত ছেলে!

অই করে যাও বাবা আমি সেই জন্যেই ত—

হঠাৎ মনোরমা মাথার আঁচল সবেগে টানিয়া দিয়া চুপ করিল। ঘরের সম্মুখে চক্রবর্ত্তী ফিরিয়া আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। কহিল, বাবু, মা এসেছেন—

অকস্মাৎ মা আসিয়াছেন শুনিয়া গোকুল ব্যস্ত হইয়া উঠিল। আজ সাত-আট দিন তাঁর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ পর্য্যন্ত নাই। কপাটের আড়ালে দাঁড়াইয়া ভবানী সহজ কণ্ঠে ডাকিলেন, গোকুল!

গোকুল তৎক্ষণাৎ সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইয়া জবাব দিল, কেন মা?

ভবানী অন্তরালে থাকিয়াই তেমনই পরিষ্কার কণ্ঠে কহিলেন, এ সব পাগলামি কর্‌তে তোমাকে কে বল্‌লে? চক্রবর্ত্তীমশাই অনেক দিনের লোক, তিনি যতদিন বাঁচবেন, আমি ততদিন তাঁকে বাহাল রাখলুম। সিন্দুকের চাবি খাতাপত্র নিয়ে তাঁকে দোকানে যেতে দাও।

ঘরের মধ্যে বজ্রাঘাত হইলেও বোধ করি লোকে এত আশ্চর্য্য হইত না। ভবানী এক মুহূর্ত্ত চুপ করিয়া থাকিয়া

পুনশ্চ কহিলেন, আর একটা কথা। বেয়াইমশাই দয়া করে এসেছেন—কুটুমের আদরে দুদিন থাকুন ; দেখুন শুনুন ; কিন্তু দোকানে আমার চুরি হচ্চে কি না হচ্চে, সে চিন্তা করবার তাঁর আবশ্যক নাই। চক্রবর্ত্তীমশাই, আপনি দেরি করবেন না, যান। আমার ইচ্ছে নয়, বাইরের লোক দোকানে ঢুকে খাতাপত্র নাড়াচাড়া করে। গোকুল চাবি দে, উনি যান্। বলিয়া কাহারো উত্তরের জন্য তিলার্দ্ধ অপেক্ষা না করিয়া চলিয়া গেলেন। ঘরের ভিতর হইতে তাঁহার পদশব্দ শুনিতে পাওয়া গেল। স্তম্ভিত ভাবটা কাটিয়া গেলে, নিমাই রায় কাষ্ঠহাসি হাসিয়া বলিলেন, একেই বলে, পরের ধনে পোদ্দারি। হুকুম দেবার ঘটাটা একবার দেখ্‌লে বাবাজী! বাবাজী কিন্তু জবাব দিল না। জবাব দিল তাঁহার নিজের পুত্ররত্নটি। সে কহিল, এ ত জানা কথাই বাবা, তুমি থাকলে ত আর চুরি চলবে না! বলিহারি হুকুমকে!

পিতা সায় দিয়া ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, তাই বটে! এবং চক্রবর্ত্তীর প্রতি দৃষ্টি পড়ায় জ্বলিয়া উঠিয়া মুখভঙ্গী করিয়া বলিলেন, আর দাঁড়িয়ে রইলে কেন হে স্যাঙ্গাত, বিদায় হও না! আবার ডেকে আনা হয়েচে! নেমকহারাম। জেলে দিলুম না কি না, তাই। দূর হও সুমুখ থেকে। বামুন বলে মনে করেছিলুম—যাক মরুক গে ; যা করেচে তা করেচে ; না হয় দু-পাঁচ টাকা দিয়ে দেব—কিন্তু, আবার! তোমাকে শ্রীঘরে পোরাই কর্ত্তব্য ছিল আমার!

কিন্তু মনোরমা স্বামীর ভাব দেখিয়া কথাটি কহিতে সাহস

করিল না। গোকুল সেই যে মাথা হেঁট করিয়া দাঁড়াইয়াছিল, ঠিক তেমনি করিয়া একভাবে কাঠের পুতুলের মত দাঁড়াইয়া রহিল। চক্রবর্ত্তী কাহারও কোন কথার জবাব না দিয়া প্রভুকে উদ্দেশ করিয়া নম্রস্বরে কহিল, তা হ'লে খাতাপত্রগুলো আমি নিয়ে চললুম। সিন্দুকের চাবিটা দিন।

গোকুল বিনাবাক্যব্যয়ে কোমর হইতে চাবির তোড়াটা চক্রবর্ত্তীর পায়ের কাছে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল। চক্রবর্ত্তী চাবি ট্যাঁকে গুঁজিয়া, খাতা বগলে পুরিয়া হাসি চাপিয়া হেলিয়া দুলিয়া প্রস্থান করিল। তাহার এই প্রস্থানের অর্থ যথেষ্ট প্রাঞ্জল। সুতরাং কাহাকেও কোন প্রশ্ন না করিয়াই, বদ্দিপাড়ার নিমাই রায়ের কালো মুখের উপর কে যেন সংসারের সমস্ত কালি ঢালিয়া দিয়া গেল।

অতঃপর এই মন্ত্রণাগৃহের মধ্যে যে দৃশ্যটি ঘটিল, তাহা সত্যই অনির্ব্বচনীয়। পিতা ও ভ্রাতার এই অচিন্ত্যনীয় বিকট লাঞ্ছনায় মনোরমা জ্ঞানশূন্যা হইয়া স্বামীর প্রতি উৎকট তিরস্কার, গঞ্জনা, সর্ব্বপ্রকার বিভীষিকা প্রদর্শন, অনুনয় বিনয় এবং পরিশেষে মর্ম্মান্তিক বিলাপ করিয়াও যখন তাঁহার মুখ হইতে পিতার স্বপক্ষে একটা কথাও বাহির করিতে পারিল না, তখন সে মুখ গুঁজিয়া মৃতপ্রায় হইয়া পড়িল। গোকুল লজ্জায় ক্ষোভে কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিল, মা যে শত্রুতা করে এমন হুকুম দেবেন, সে আমি কি করে জানব?

নিমাই একটা সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, যাক্ বাঁচা গেল। একটা মস্ত ঝঞ্ঝাটের হাত এড়ালুম। ওদিকে

শিবতুল্য মনিব আমার কাঁদা-কাটা করচেন—আমার কি কোথাও থাকবার যো আছে। তা ছাড়া, দরকার কি আমার ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়িয়ে! কিন্তু মা মনু, ছেলে-পিলের হাত ধরে যদি পথে দাঁড়াও—সে ত দাঁড়াতেই হবে, চোখের উপর দেখতে পাচ্ছি—তখন কিন্তু আমাকে দোষ দিতে পারবে না যে, বাবা একবার ফিরেও তাকালে না। সে বাবা আমি নই, তা বলে যাচ্ছি—তা মেয়েই হও আর জামাতাই হও। বলিয়া তিনি জামাতার প্রতিই একটা তীব্র বক্র কটাক্ষ করিলেন। কিন্তু সে কটাক্ষ ছেলে ছাড়া আর কাহারও কাজে লাগিল না। তিনি তখন আবার প্রদীপ্ত কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, এখনো বেঁকে বসে নি বটে, কিন্তু বেঁকলে নিমাই রায় কারু নয়। ব্রহ্মা-বিষ্ণুরও অসাধ্য—তা তোমরা দুজনে একবার গোপনে ভেবে দেখো। বাবা নন্দদুলাল, আড়াইটে বেজেছে, সাড়ে তিনটের গাড়ীতে আমি যাব। জিনিষপত্র গুছিয়ে নাও—জান ত তোমার বাপের কথার নড়চড় পৃথিবী উল্‌টে গেলেও হবার যো নেই। বলিয়া তিনি সদর্পে ছেলের হাত ধরিয়া মেয়ে জামাইকে ভাবিবার একঘণ্টা মাত্র সময় দিয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন।

কিন্তু কোন কাজই হইল না। একঘণ্টা অতি অল্প সময়—তিনদিন পর্য্যন্ত উপস্থিত থাকিয়া, অবিশ্রাম মান-অভিমান রাগারাগি এবং কটূক্তি করিয়াও গোকুলের মুখ হইতে দ্বিতীয় কথা বাহির করা গেল না। শ্বশুরের এই অত্যন্ত অপমানে তাহার নিজেরই লজ্জা ও ক্ষোভের সীমা পরিসীমা ছিল না।

কিন্তু মায়ের সুস্পষ্ট আদেশের বিরুদ্ধে সে যে কি করিবে তাহা কোনদিকে চাহিয়া দেখিতে না পাইয়াই, সর্ব্বপ্রকার লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা নীরবে সহ্য করিতে লাগিল।

১১

নিমাই যখন দেখিলেন, তাঁহার সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা, জল্পনা-কল্পনা নিষ্ফল হইয়া গেল, তখন তিনি ভীষণ হইয়া উঠিলেন এবং স্পষ্ট শাসাইয়া দিতে বাধ্য হইলেন যে, তাঁহাকে চাকরি ছাড়াইয়া আনার দরুণ ক্ষতিপূরণ করিতে হইবে। তিনি বাঁড়ুয্যেমশাইকে ইতিমধ্যে হাত করিয়াছিলেন। তিনি আসিয়া গোকুলকে নির্ব্বোধ বলিয়া, অন্ধ বলিয়া তিরস্কার করিতে লাগিলেন এবং এমন একটা ভয়ানক ইঙ্গিত করিলেন, যাহাতে বুঝা গেল, নিমাই রায়কে অপমান করিলে সে বিনোদকে গিয়াও সাহায্য করিতে পারে।

গোকুল কাতরকণ্ঠে কহিল, কি করব মাষ্টারমশাই, মা যে তাঁকে বাড়িতে রাখতেই চান না। চক্রবর্ত্তীমশাইকে হুকুম দিয়েচেন দোকানে পর্য্যন্ত যেন তিনি না ঢোকেন।

মাষ্টারমশাই প্রশ্ন করিলেন, কারবার, বিষয়-আশয় তোমার, না তোমার মায়ের গোকুল? তা ছাড়া তোমার বিমাতা এখন তোমার শত্রুপক্ষে, সে সংবাদ রেখেচ ত?

গোকুল ঘাড় নাড়িয়া সায় দিলে বাঁড়ুয্যেমশাই খুসি হইয়া বলিলেন, তবে 'পাগলামি ক'র না ভায়া; রায়মশাইকে

বিষয়-আশয়, ব্যবসা-বাণিজ্য সব বুঝিয়ে, চুপটি করে বসে বসে শুধু মজা দেখ! আমার কথা ছেড়ে দাও, নইলে অমন পাকা লোক একটি এ-তল্লাটে খুঁজলে পাবে না।

গোকুল কহিল, সে ত জানি মাষ্টারমশাই; কিন্তু মায়ের অমতে কোন কাজ করতে বাবা যে নিষেধ করে গেছেন।

বাঁড়ুয্যেমশাই বিদ্রূপ করিয়া হাসিয়া বলিলেন, নিষেধ! মা যে তোমার শত্রু হয়ে দাঁড়াবে, সে কি তোমার বাবা জেনে গিয়েছিলেন? নিষেধ করলেই ত হ'ল না। নিষেধ শুনতে গিয়ে কি বিষয়টি খোয়াবে? তা বল? গোকুলের তরফে এ সকল প্রশ্নের জবাব ছিল না; তাই সে ঘাড় গুঁজিয়া নিঃশব্দে বসিয়া রহিল। রায়মশাই নেপথ্যে থাকিয়া সমস্তই শুনিতেছিলেন। এবার সদরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং এই দুইজন মহা-রথীর সমবেত জেরার মুখে গোকুল অকূলে ভাসিয়া গেল। তাহাকে অধোবদন এবং নিরুত্তর দেখিয়া উভয়েই প্রীত হইলেন এবং তাহার এই সুবুদ্ধির জন্য তাহাকে বারংবার প্রশংসা করিলেন।

বাঁড়ুয্যেমশাই বাটী ফিরিতে উদ্যত হইলে, সফল-মনোরথ রায়মশাই আজ তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিয়া প্রণাম করিলেন এবং তিনি সস্নেহে গোকুলের পিঠ চাপড়াইয়া কহিলেন, আমি আশীর্ব্বাদ করচি গোকুল, তুমি যেমন তোমার যথা-সর্ব্বস্ব আমাদের হাতে সঁপে দিলে—তোমার তেমনি গায়ে আঁচড়টি পর্য্যন্ত আমরা লাগতে দেব না। কি বল রায়মশাই?

রায়মশাই আনন্দে বিনয়ে গদগদ হইয়া কহিলেন, আপনার

আশীর্ব্বাদে সে দেশের পাঁচজন দেখ্‌তেই পাবে। কিন্তু শত্রুদের আর আমি এ বাড়িতে একটি দিনও থাক্‌তে দেব না, তা আপনাকে জানিয়ে দিচ্চি বাঁড়ুয্যেমশাই। তা তাঁরা আমার বাবাজীর মা-ই হোন্‌, আর ভাই-ই হোন্‌। আর সেই ব্যাটা চক্কোত্তিকে আমি তাড়িয়ে তবে জলগ্রহণ করব। কে আছিস্‌ রে ওখানে? ব্যাটা বামুনকে ডেকে আন্‌ দোকান থেকে। বলিয়া রায়মশাই ইহারই মধ্যে ষোল আনা ছাপাইয়া সতর আনার মত একটা হুঙ্কার ছাড়িলেন।

গোকুল সঙ্কুচিত ও অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া মৃদু স্বরে কহিল, না না, এখন তাঁকে ডাকবার আবশ্যক নেই।

বাঁড়ুয্যেমশাই দুই হাত দুই দিকে প্রসারিত করিয়া বলিয়া উঠিলেন, না না, গোকুল, এসব চক্ষু-লজ্জার কাজ নয়! তাকে আমরা রাখ্‌তে পারব না—কোন মতেই না। তার বড় আস্পর্দ্ধা। আমরা তাকে চাই নে, তা বলে দিচ্চি।

প্রত্যুত্তরে গোকুল তেম্‌নি বিনীত কণ্ঠে কহিল, কিন্তু মা তাঁকে চান। তিনি যাঁকে বাহাল করেছেন, তাঁকে ছাড়িয়ে দেবার সাধ্য কারুর নেই। বাবা আমাকে সে ক্ষমতা দিয়ে যান নি। বলিয়া গোকুল পুনরায় মুখ হেঁট করিল। তাহার এই একান্ত অপ্রত্যাশিত উত্তর, এই শান্ত অথচ দৃঢ় কণ্ঠস্বর শুনিয়া উভয়েই বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া গেল। কিছুক্ষণ স্থির থাকিয়া বাঁড়ুয্যেমশাই কহিলেন, তা হ'লে সে থাক্‌বে বল?

গোকুল কহিল, আজ্ঞে হাঁ। চক্কোত্তিমশায়ের উপর আমার আর কোন হাত নেই।

বাঁড়ুয্যেমশাই ভয়ে ভয়ে বলিলেন, তা হ'লে রায়মশায়ের কি রকম হবে ?

গোকুল কহিল, উনি বাড়ি যান। মা কোনমতেই ওঁকে এখানে রাখ্‌তে চান না। আর চাকৃরি ছাড়ায় ক্ষতি যা হয়েচে, সে আমি মাকে জিজ্ঞেসা করে পাঠিয়ে দেব। বলিয়া কাহারও উত্তরের জন্য অপেক্ষা মাত্র না করিয়া প্রস্থান করিল।

সবাই মনে করিয়াছিল, এতবড় অপমানের পর রায়মশাই আর তিলার্দ্ধ অবস্থান করিবেন না। কিন্তু আট-দশ দিন কাটিয়া গেল—এই মনে করার বিশেষ কোন মূল্য দেখা গেল না। বোধ করি বা কন্যা-জামাতার প্রতি অসাধারণ মমতাবশতঃই তিনি ছোট কথা কানে তুলিলেন না এবং সরজমিনে উপস্থিত থাকিয়া অহর্নিশ তাহাদের হিতচেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু এই হিতাকাঙ্ক্ষার প্রবল দাপটে একদিকে গোকুল নিজে যেমন পীড়িত ও সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠিতে লাগিল, ওদিকে বাটীর মধ্যে ভবানীও তেম্‌নি প্রতি মুহূর্ত্তেই অতিষ্ঠ হইয়া উঠিতে লাগিলেন। বধূ ও তাহার পিতার পরিত্যক্ত শব্দভেদী বাণ খাইতে-শুইতে-বসিতে তাঁহার দুই কানের মধ্যে দিয়া অবিশ্রাম বুকে বিঁধিতে লাগিল।

সেদিন তিনি আর সহ্য করিতে না পারিয়া বধূমাতাকে ডাকিয়া বলিলেন, বৌমা, গোকুল কি চায় না যে, আমি বাড়িতে থাকি ?

বৌমা জবাব ইচ্ছা করিয়াই দিল না—মাথা হেঁট করিয়া নখের কোণ খুঁটিতে লাগিল। ভবানী কিছুক্ষণ স্থির থাকিয়া

কহিলেন, বেশ তাই যদি তার ইচ্ছে, সে নিজে এসে স্পষ্ট করে বলে না কেন? এমন করে তোমার ভাইকে দিয়ে, তোমার বাপকে দিয়ে আমাকে দিবারাত্রি অপমান করাচ্ছে কেন?

অথচ গোকুল যে ইহার বাষ্পও না জানিতে পারে, এমন কি তাহাকে সম্পূর্ণ গোপন করিয়াই যে এই ক্ষুদ্রাশয়েরা তাহাদের বিষদন্ত বাহির করিয়া দংশন করিয়া ফিরিতেছিল, এ কথা ভবানীর একবার মনেও হইল না। কিন্তু বধূ ত আর সে বধূ নাই! সে তৎক্ষণাৎ প্রত্যুত্তর করিল, অপমান কে কাকে করেচে, সে কথা দেশশুদ্ধ লোক জানে। আমার নিজের জিনিস যদি আমি চোরের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে, আমার বাপ ভাইকে তুলে দিতে যাই, তাতে তোমার বুকে শূল বেঁধে কেন মা? আর একজনের জন্যে আর একজনের সর্ব্বনাশ করাটাই কি ভাল?

ভবানী আত্মসংবরণ করিয়া ধীরভাবে বলিলেন, আমি কার সর্ব্বনাশ করেছি মা?

বধূ কহিল, যাদের করেচ তারাই গাল দিচ্চে। এতে তিনিই বা কি করবেন, আর আমিই বা করব কি! ইঁট মারলেই পাটকেলটি খেতে হয়—তাতে রাগ করলে ত চলে না মা। বলিয়া বধূ চলিয়া গেল।

ভবানী স্তম্ভিত হইয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে নিজের ঘরে গিয়া শুইয়া পড়িলেন। স্বামীর জীবদ্দশায় তাঁহার সেই গোকুল এবং সেই গোকুলের স্ত্রীর কথা মনে করিয়া, অনেকদিন পর আজ আবার তাঁহার চোখ দিয়া জল পড়িতে

লাগিল। আজ আর কোনমতেই মন হইতে এ অনুশোচনা দূর করিতে পারিলেন না যে, নির্ব্বোধ তিনি শুধু নিজের পায়েই কুঠারাঘাত করেন নাই, ছেলের পায়েও করিয়াছেন। অমন করিয়া যাচিয়া সমস্ত ঐশ্বর্য্য গোকুলকে লিখাইয়া না দিলে ত আজ এ দুর্দ্দশা ঘটিত না। বিনোদ যত মন্দই হোক্ কিছুতেই সে জননীকে এমন করিয়া অপমান ও নির্য্যাতন করিতে পারিত না।

কিন্তু বিনোদ যে গোপনে উপার্জ্জনের চেষ্টা করিতেছিল, তাহা কেহ জানিত না। সে আদালতে একটা চাক্‌রি যোগাড় করিয়া লইয়া এবং সহরের একপ্রান্তে একটা ছোট বাড়ি ভাড়া করিয়া, সন্ধ্যার পর আসিয়া সংবাদ দিল যে, কাল সকালেই সে তাহার নূতন বাসায় যাইবে।

ভবানী আগ্রহে উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, বিনোদ, আমাকেও নিয়ে চল্ বাবা, এ অপমান আমি আর সইতে পারি নে। তুই যেমন করে রাখবি, আমি তেমনি করে থাকব; কিন্তু এ বাড়ি থেকে আমাকে মুক্ত করে দে। বলিয়া তিনি কাঁদিতে লাগিলেন।

তারপর একটি একটি করিয়া সমস্ত ইতিহাস শুনিয়া লইয়া বিনোদ বাহিরে যাইতেছিল, পথে গোকুলের সহিত দেখা হইল। সে দোকানের কাজকর্ম্ম সারিয়া ঘরে আসিতেছিল। অন্যদিন এ অবস্থায় বিনোদ দূর হইতেই পাশ কাটাইয়া সরিয়া যাইত, আজ দাঁড়াইয়া রহিল। বিনোদ কাছে আসিয়া কহিল, কাল সকালেই মাকে নিয়ে আমি নূতন বাসায় যাব।

গোকুল অবাক্ হইয়া কহিল, নূতন বাসায় ? আমাকে না জিজ্ঞেসা করেই বাসা করা হয়েচে না কি ?

বিনোদ কহিল, হাঁ।

এম-এ পড়া তা হ'লে ছাড়লে বল ?

বিনোদ কহিল, হাঁ।

সংবাদটা গোকুলকে যে কিরূপ মর্ম্মান্তিক আঘাত করিল, সন্ধ্যার অন্ধকারে বিনোদ তাহা দেখিতে পাইল না। ছোট ভাইয়ের এই এম-এ পাশের স্বপ্ন সে শিশুকাল হইতেই দেখিয়া আসিয়াছে। পরিচিতের মধ্যে যেখানে যে-কেহ কোন-একটা পাশ করিয়াছে—খবর পাইলেই, গোকুল উপযাচক হইয়া সেখানে গিয়া হাজির হইত এবং আনন্দ প্রকাশ করিয়া শেষে এম-এ পরীক্ষাটা শেষ হওয়ার জন্য নিজের অত্যন্ত দুশ্চিন্তা প্রকাশ করিত। ব্যাপারটা যাহারা জানিত, তাহারা মুখ টিপিয়া হাসিত। যাহারা জানিত না, তাহারা উদ্বেগের হেতু জিজ্ঞাসা করিলেই 'আমার ছোটভাই বিনোদের অনার গ্রাজুয়েটে'র কথাটা উঠিয়া পড়িত। তখন কথায় কথায় অন্যমনস্ক হইয়া বিনোদের সোনার মেডেলটাও বাহির হইয়া পড়িত। কিন্তু কি করিয়া যে মকমলের বাক্সসুদ্ধ জিনিষটা গোকুলের পকেটে আসিয়া পড়িয়াছে, তাহার কোন হেতুই সে স্মরণ করিতে পারিত না। তাহার একান্ত অভিলাষ ছিল, স্যাক্রা ডাকাইয়া এই দুর্ল্লভ বস্তুটি নিজের ঘড়ির চেনের সঙ্গে জুড়িয়া লয় এবং এতদিনে তাহা সমাধা হইয়াও যাইত—যদি না বিনোদ ভয় দেখাইত—এরূপ পাগলামি করিলে সে সমস্ত টান মারিয়া

পুকুরের জলে ফেলিয়া দিবে। গোকুল উদ্‌গ্রীব হইয়া অপেক্ষা করিয়াছিল, এম-এর মেডেলটা না-জানি কিরূপ দেখিতে হইবে এবং এ বস্তু ঘরে আসিলে কোথায় কি ভাবে তাহাকে রক্ষা করিতে হইবে।

এ হেন এম-এ পাশের পড়া ছাড়িয়া দেওয়া হইল শুনিয়া গোকুলের বুকে তপ্ত শেল বিঁধিল। কিন্তু আজ সে প্রাণপণে আত্মসংবরণ করিয়া লইয়া কহিল, তা বেশ, কিন্তু মাকে নূতন বাসায় নিয়ে গিয়ে খাওয়াবে কি শুনি?

সে দেখা যাবে। বলিয়া বিনোদ চলিয়া গেল। সে নিজেও মায়ের মত অল্পভাষী। যে সকল কথা সে এইমাত্র শুনিয়া আসিয়াছিল, তাহার কিছুই দাদার কাছে প্রকাশ করিল না।

গোকুল বাড়ির ভিতরে পা দিতে না দিতেই, হাবুর মা সংবাদ দিল, মা একবার ডেকেছিলেন। গোকুল সোজা মায়ের ঘরে আসিয়া দেখিল, তিনি এমন সন্ধ্যার সময়েও নির্জ্জীবের মত শয্যায় পড়িয়া আছেন। ভবানী উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, গোকুল, কাল সকালেই আমি এ বাড়ি থেকে যাচ্ছি।

সে এই মাত্র বিনোদের কাছে শুনিয়া মনে মনে জ্বলিয়া যাইতেছিল; তৎক্ষণাৎ জবাব দিল, তোমার পায়ে ত আমরা কেউ দড়ি দিয়ে রাখি নি মা। যেখানে খুসি যাও, আমাদের তাতে কি? গেলেই বাঁচি। বলিয়া গোকুল মুখ ভার করিয়া চলিয়া গেল।

পরদিন সকাল-বেলায় ভবানী যাত্রার উদ্যোগ করিতেছিলেন। হাবুর মা কাছে বসিয়া সাহায্য করিতেছিল।

গোকুল উঠানের উপর দাঁড়াইয়া চেঁচাইয়া কহিল, হাবুর মা, আজ ওঁর যাওয়া হতে পারে না, বলে দে।

হাবুর মা আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কেন বড়বাবু?

গোকুল কহিল, আজ দশমী না? ছিলে-পিলে নিয়ে ঘর করি, আজ গেলে গেরস্থের অকল্যাণ হয়। আজ আমি কিছুতেই বাড়ি থেকে যেতে দিতে পারব না বলে দে। ইচ্ছা হয় কাল যাবেন—আমি গাড়ী ফিরিয়ে দিয়েচি। বলিয়া গোকুল দ্রুতপদে প্রস্থান করিতেছিল, মনোরমা হাত নাড়িয়া তাহাকে আড়ালে ডাকিয়া লইয়া তর্জ্জন করিয়া কহিল, যাচ্ছিলেন, আটকাতে গেলে কেন?

এ কয়দিন স্ত্রীর সহিত গোকুলের বেশ বনিবনাও হইতেছিল। আজ সে অকস্মাৎ মুখ ভ্যাঙাইয়া চেঁচাইয়া উঠিল, আটকালুম আমার খুসি। বাড়ির গিন্নী, অদিনে, অক্ষণে বাড়ি থেকে গেলে ছেলে-পিলেগুলো পট্ পট্ করে মরে যাবে না? বলিয়া তেমনি দ্রুতবেগে বাহিরে চলিয়া গেল।

রকম ছাখো! বলিয়া মনোরমা ক্রুদ্ধ বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া রহিল।

দশমীর পর একাদশী গেল, দ্বাদশীও গেল, মাকে পাঠাইবার মত তিথি নক্ষত্র গোকুলের চোখে পড়িল না। ত্রয়োদশীর দিন বাটির পুরোহিত নিজে আসিয়া সুদিনের সংবাদ দিবামাত্র গোকুল অকারণে গরম হইয়া কহিল, তুমি যার খাবে, তারই সর্ব্বনাশ করবে? যাও, নিজের কাজে যাও, আমি মাকে কোথাও যেতে দিতে পারব না।

মনোরমা সেদিন ধমক খাইয়া অবধি নিজে কিছু বলিত না, আজ সে তাহার পিতাকে পাঠাইয়া দিল। নিমাই আসিয়া কহিলেন, এটা ত ভাল কাজ হচ্চে না বাবাজী!

গোকুল কোনদিন খবরের কাগজ পড়ে না, কিন্তু আজ পড়িতে বসিয়াছিল। কহিল, কোন্‌টা?

বেয়ানঠাকরুণ তাঁর নিজের ছেলের বাসায় যখন স্ব-ইচ্ছায় যেতে চাচ্চেন, তখন আমাদের বাধা দেওয়া ত উচিত হয় না।

গোকুল পড়িতে পড়িতে কহিল, পাড়ার লোক শুন্‌লে আমার অখ্যাতি কর্‌বে।

নিমাই অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, অখ্যাতি করবার আমি ত কোন কারণ দেখতে পাই নে।

গোকুল শ্বশুরকে এতদিন মান্য করিয়াই কথা কহিত। আজ হঠাৎ আগুন হইয়া কহিল, আপনার দেখবার ত কোন প্রয়োজন দেখি নে। আমার মাকে আমি কারু কাছে পাঠাব না—বাস্, সাফ্ কথা! যে যা পারে আমার করুক।

গোকুলের এই সাফ্ কথাটা বিনোদের কানে গিয়া পৌঁছিতে বিলম্ব হইল না। প্রত্যহ বাধা দিয়া গাড়ী ফেরৎ দেওয়ায় সে মনে মনে বিরক্ত হইতেছিল। আজ অত্যন্ত রাগিয়া আসিয়া কহিল, দাদা, মাকে আমি আজ নিয়ে যাব। আপনি অনর্থক বাধা দেবেন না!

গোকুল সংবাদপত্রে অতিশয় মনোনিবেশ করিয়া কহিল, আজকে ত হতে পার্‌বে না।

বিনোদ কহিল, খুব পার্‌বে। আমি এখনি নিয়ে যাচ্ছি।

তাহার ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর শুনিয়া গোকুল হাতের কাগজটা এক পাশে ফেলিয়া দিয়া কহিল, নিয়ে যাচ্ছি বল্‌লেই কি হবে? বাবা মর্‌বার সময় মাকে আমায় দিয়ে গেছেন—তোমাকে দেন নি। আমি কোথাও পাঠাবনা।

বিনোদ কহিল, সে ভার যদি আপনি বাস্তবিক নিতেন দাদা, তা হলে এমন করে মাকে দিবারাত্রি লাঞ্ছনা অপমান ভোগ কর্‌তে হ'ত না। মা, বেরিয়ে এসো, গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে। বলিয়া বিনোদ পশ্চাতে দৃষ্টিপাত করিতেই ভবানী বাহির হইয়া আসিলেন। তিনি যে অন্তরালে আসিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন, তাহা গোকুল জানিত না। তাঁহাকে সোজা গিয়া গাড়ীতে উঠিতে দেখিয়া গোকুল আড়ষ্ট হইয়া খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া অবশেষে পিছনে পিছনে গাড়ীর কাছে আসিয়া কহিল, এমন জোর করে চলে গেলে আমার সঙ্গে তোমাদের আর কোন সম্পর্ক থাকবে না, তা বলে দিচ্ছি মা।

ভবানী জবাব দিলেন না; বিনোদ গাড়োয়ানকে ডাকিয়া

গাড়ী হাঁকাইতে আদেশ করিল। গাড়ী ছাড়িয়া দিতেই গোকুল অকস্মাৎ রুদ্ধকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, ফেলে চলে গেলে মা, আমি কি তোমার ছেলে নই? আমাকে কি তোমার মানুষ করতে হয়নি?

গাড়ীর চাকার শব্দে সে কথা ভবানীর কানে গেল না, কিন্তু বিনোদের কানে গেল। সে মুখ বাড়াইয়া দেখিল, গোকুল কোঁচার খুঁটে মুখ ঢাকিয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিল।* এবং ভিতরে ঢুকিয়া সে বিনোদের বসিবার ঘরে গিয়া দোর দিয়া শুইয়া পড়িল। তাহার এই ব্যবহার অলক্ষ্যে থাকিয়া লক্ষ্য করিয়া নিমাই কিছু উদ্বিগ্ন হইতেছিলেন; কিন্তু খানিক পরে সে যখন দ্বার খুলিয়া বাহির হইল এবং যথাসময়ে স্নানাহার করিয়া দোকানে চলিয়া গেল, তখন তাহার চোখে মুখে এবং আচরণে বিশেষ কোন ভয়ের চিহ্ন না দেখিয়া তিনি হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। এবং নির্ব্বিঘ্ন হইয়া তিনি এইবার নিজের কাজে মন দিলেন। অর্থাৎ সাপ যেমন করিয়া তাহার শিকার ধীরে ধীরে উদরস্থ করে, ঠিক্ তেম্নি করিয়া তিনি জামাতাকে মহা আনন্দে জীর্ণ করিয়া ফেলিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন।

লক্ষণও বেশ অনুকূল বলিয়াই মনে হইল। গোকুল পিতার মৃত্যুর পর হইতেই অত্যন্ত উগ্র এবং অসহিষ্ণু হইয়া উঠিয়াছিল, সামান্য কারণেই বিদ্রোহ করিত; কিন্তু যে দিন ভবানী চলিয়া গেলেন, সেই দিন হইতে সে যেন আলাদা মানুষ হইয়া গেল। কাহারও কোন কথায় রাগও করিত না, প্রতিবাদ করিত না।

ইহাতে নিমাই যত পুলকিতই হউন, তাঁহার কন্যা খুসি হইতে পারিল না। গোকুলকে সে চিনিত। সে যখন দেখিল, স্বামী খাওয়া-দাওয়া লইয়া হাঙ্গামা করে না, যা পায় নীরবে খাইয়া উঠিয়া যায়, তখন সে ভয় পাইল। এই জিনিষটাতেই গোকুলের ছেলেবেলা হইতেই একটু বিশেষ সখ ছিল। খাইতে এবং খাওয়াইতে সে ভালবাসিত। প্রতি রবিবারেই সে বন্ধুরান্ধবদের নিমন্ত্রণ করিয়া আসিত; এ রবিবারে তাহার কোনরূপ আয়োজন না দেখিয়া মনোরমা প্রশ্ন করিল।

গোকুল উদাসভাবে জবাব দিল, সে সব মায়ের সঙ্গে সঙ্গে গেছে। রেঁধে খাওয়াবে কে? মনোরমা অভিমানভরে কহিল, রাঁধ্‌তে কি শুধু মা-ই শিখেছিলেন—আমরা শিখিনি? গোকুল কহিল, সে তোমার বাপ ভাইকে খাইয়ো, আমার দরকার নেই।

মনোরমার মা কালীঘাটের ফেরত একদিন আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সৎ-শাশুড়ী রাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন, মেয়ের ভাঙা সংসার গুছান আবশ্যক বিবেচনা করিয়া তিনি দুই চারি দিন থাকিয়া যাইতেই মনস্থ করিলেন।

দেখিতে দেখিতে বিকল সংসার মেরামত হইয়া আবার সুন্দর চলিতে লাগিল; এবং কর্ণধার হইয়া দৃঢ়হস্তে হাল ধরিয়া দিনের পর দিন কাটাইতে লাগিলেন।

পাড়ার লোকেরা প্রথমে কথাটা লইয়া আন্দোলন করিল, কিন্তু কলিকালের স্বধর্ম্মে দুই-চারিদিনেই নিরস্ত হইল।

হাবুর মার ঘর এই পথে। সে মাঝে মাঝে দেখা দিয়া

যাইত। তার মুখে ভবানী গোকুলের নূতন সংসারের কাহিনী শুনিতে পাইলেন, কিন্তু ভাল-মন্দ কোন কথা কহিলেন না।

সেদিন আসিবার সময় সেই যে গোকুল গাড়ীর কাছে দাঁড়াইয়া রুদ্ধকণ্ঠে বলিয়াছিল, তাঁহাদের সমস্ত সম্বন্ধের এই শেষ, তখন নিজের অভিমানের কথাটা তিনি গ্রাহ্য করেন নাই। কিন্তু একমাস কাল যখন কাটিয়া গেল, গোকুল তাঁহার সংবাদ লইল না, তখন তিনি মনে মনে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন। সে যে সত্য সত্যই তাঁহাকে ত্যাগ করিবে, ছোটভাইকে এমন করিয়া ভুলিয়া থাকিবে, এত কাণ্ড, এত রাগারাগির পরেও সে কথা নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। তাই আজ হাবুর মার মুখে ঘরের মধ্যে তাহার শ্বশুর-শাশুড়ীর দৃঢ় প্রতিষ্ঠার বার্ত্তা পাইয়া তিনি শুধু স্তব্ধ হইয়াই রহিলেন।

নূতন বাসায় আসিয়া দুই-চারিদিন মাত্র বিনোদ সংযত ছিল, তারপরেই সে স্বরূপ প্রকাশ করিল। মায়ের কোন তত্ত্বই প্রায় সে লইত না ; রাত্রে বাড়িতে থাকিত না ; সকালে যখন ঘরে আসিত, তখন দুঃখে লজ্জায় ভবানী তাহার প্রতি চাহিতে পারিতেন না।

এই মাত্র শুনিয়াছিলেন, সে চাকরী করে। কিন্তু কি চাকরি, কত মাহিনা, কিছুই জানিতেন না। সুতরাং এখন এইটাই তাঁহার একমাত্র সান্ত্বনা ছিল যে, আর যাই হোক, তিনি ছেলেকে বিষয় হইতে বঞ্চিত করিবার নিমিত্ত হইয়া অন্যায় করেন নাই, কারণ গোকুল স্ত্রী-শ্বশুর-শাশুড়ীর প্রভাবে তাঁহাদের প্রতি যত অন্যায়ই করুন, সে স্বামীর এত দুঃখের

দোকানটা অন্ততঃ বজায় করিয়া রাখিবে, স্বর্গীয় স্বামীর কথা মনে করিয়া তিনি এ চিন্তাতেও কতকটা সুখ পাইতেন। এমনি করিয়াই দিন কাটিতেছিল। আজ বৈশাখী সংক্রান্তি। প্রতি বৎসর এই দিনে ঘটা করিয়া ব্রাহ্মণভোজন করাইতেন। কিন্তু এবার নিজের কাছে টাকা না থাকায় এবং কথা-প্রসঙ্গে বিনোদকে বার-দুই জানাইয়াও তাহার কাছে সাড়া না পাওয়ায় এ বৎসর ভবানী সে সঙ্কল্পই পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। সহসা অতি প্রত্যূষে ভয়ানক ডাকাডাকি, হাবুর মা সদর দরজা খুলিয়া দিতেই গোকুল ব্যস্ত হইয়া প্রবেশ করিল। সঙ্গে তাহার অনেক লোক, ঘি, ময়দা, বহুপ্রকার মিষ্টান্ন, ঝুড়িভরা পাকা আম। ঢুকিয়াই কহিল, আমাদের পাড়ার সমস্ত বামুনদের নেমন্তন্ন করে এসেচি—সে বাঁদরটার পিত্যেশে ত আর ফেলে রাখতে পারিনে। মা কই? এখনো ওঠেন নি বুঝি? যাই, কাজকর্ম্ম করবার লোকজন গিয়ে পাঠিয়ে দিইগে। যেমন মা—তেমনি ব্যাটা, কারো চাড়ই নেই, যেন আমারই বড় মাথাব্যথা! মাকে খবর দিগে হাবুর মা, আমি ঘণ্টা-খানেকের মধ্যেই ফিরে আসচি। বলিয়া গোকুল যেমন ব্যস্ত হইয়া প্রবেশ করিয়াছিল, তেমনি ব্যস্ত হইয়া বাহির হইয়া গেল।

ভবানী অনেকক্ষণ উঠিয়াছিলেন এবং আড়ালে দাঁড়াইয়া সমস্তই দেখিতেছিলেন। গোকুল চলিয়া যাইবামাত্রই অকস্মাৎ অশ্রুর বন্যা আসিয়া তাঁহার দুই চোখ ভাসাইয়া দিয়া গেল। সেদিন ছিল রবিবার। 'শনিবারের রাত্রি' করিয়া অনেক বেলায় বিনোদ বাড়ি ঢুকিয়া অবাক্ হইয়া গেল! হাবুর মার কাছে

সমস্ত অবগত হইয়া মাকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, দাদাকে খবর দিয়ে এর মধ্যে না এনে আমাকে জানালেই ত হ'ত! আমার যে এতে অপমান হয়!

ভবানী সমস্ত বুঝিয়াও প্রতিবাদ করিলেন না। চুপ করিয়া রহিলেন। গোকুল ফিরিয়া আসিয়া বিনোদকে দেখিয়াও দেখিল না। কাজকর্ম্মের তদারক করিয়া ফিরিতে লাগিল এবং যথাসময়ে ব্রাহ্মণভোজন সমাধা হইয়া গেলে, কাহাকেও কোন কথা না কহিয়া বাহির হইবার উপক্রম করিতেছিল, এমন সময় বাঁড়ুয্যেমশাই তাহাকে সকলের মধ্যে আহ্বান করিয়া কহিলেন, ব'স!

আজ তিনিও গোকুলের দ্বারা নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছিলেন। তাই তাহারই টাকায় পরিতোষ পূর্ব্বক আহার করিয়া সে দিনের অপমানের শোধ তুলিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মজুমদারদের অনেক অন্নই নাকি তিনি হজম করিয়াছিলেন, তাই নিমাই রায়ের দরুণ সে দিনের লাঞ্ছনাটা তাঁহাকেই বেশি বাজিয়াছিল। সর্ব্বসমক্ষে বিনোদকে উদ্দেশ করিয়া চোখ টিপিয়া কহিলেন, বলি ভায়া, দাদার আজকের চাল্‌টা টের পেয়েচ ত।

কথার ধরণে গোকুল সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল।

বিনোদ সংক্ষেপে কহিল, না।

বাঁড়ুয্যেমশাই মৃদুগম্ভীর হাস্য করিয়া কহিলেন, তবেই দেখ্‌চি মকদ্দমা জিতেচ! বি-এ, এম-এ পাশ করলে ভাই, আর এটা ঠাওর হ'ল না যে, মাকে হাত করাটাই হচ্চে যে আজকের চাল্‌। তাঁর ওপরই যে মকদ্দমা!

গোকুল চোখ মুখ কালিবর্ণ করিয়া—কখ্‌খনো না মাষ্টার-মশাই, কখ্‌খনো না! বলিতে বলিতে বেগে প্রস্থান করিল।

বাঁড়ুয্যেমশাই চেঁচাইয়া বলিলেন, এখানে ঢুক্‌তে দিয়ো না ভায়া, সর্ব্বনাশ করে তোমার ছাড়্‌বে।

এ কথাটাও গোকুলের কানে পৌঁছিল।

বিনোদ লজ্জায় ঘাড় হেঁট করিয়া বসিয়া রহিল। দাদাকে সে যে না চিনিত, তাহা নয়। একটা উদ্দেশ্য লইয়া আর একটা কাজ করা যে তাহার দ্বারা একেবারেই অসম্ভব, তাহাও সে জানিত। তাই বাঁড়ুয্যের কথাগুলা শুধু যে সে সম্পূর্ণ অবিশ্বাস করিল তাহা নয়, এত লোকের সমক্ষে দাদার এই অপমান তাহাকে অত্যন্ত বিঁধিল।

নিমন্ত্রিতেরা বিদায় হইলে বিনোদ ভিতরে গিয়া, দেখিল—মা ঘরে দ্বার দিয়া শুইয়া পড়িয়াছেন। কথাটা যে তাঁর কানে গিয়াছে, তাহা কাহাকেও জিজ্ঞাসা না করিয়াই বিনোদ টের পাইল।

দোকানের কাজ সারিয়া সন্ধ্যার পর গোকুল নিজের ঘরে ঢুকিয়া দেখিল—সেখানেও একটা বিরাট মুখভারীর অভিনয় চলিতেছে। স্বয়ং রায়মশাই খাটের উপর বসিয়া মুখখানা অতি বিশ্রী করিয়া বসিয়া আছেন এবং নিজে মেঝের উপর বসিয়া তাঁহার কন্যা হিমুকে কাছে লইয়া পিতৃ-মুখের অনুকরণ করিতেছে।

ঘরে ঢুকিতেই রায়মশাই কহিলেন, বাবাজী, নির্ব্বোধের মত

তুমি এই যে আমাদের আজ তোমার মাকে দিয়ে অপমান করালে, তার প্রতিকার কি বল ?

একে গোকুলের যারপরনাই মন খারাপ হইয়াছিল, তাহাতে সারা দিনের পরিশ্রমে অতিশয় শ্রান্ত ! অভিযোগের ধরণটায় তাহার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেল। মনোরমা ফোঁস্ ফোঁস্ করিয়া কাঁদিয়া কহিল, আর যদি কোন দিন তুমি ওখানে যাও—আমি গলায় দড়ি দিয়ে মর্‌ব।

মেয়ের উৎসাহ পাইয়া রায়মশাই অধিকতর গম্ভীরভাবে কহিলেন, সে মাগী কি সোজা—

গোকুল বোমার মত ফাটিয়া উঠিল—চোপরাও বল্‌চি। আমার মায়ের নামে ওরকম কথা কইলে ঘাড় ধরে বার করে দেব। বলিয়া নিজেই ঝড়ের মত বাহির হইয়া গেল।

রায়মশাই ও তাঁহার কন্যা বজ্রাহতের ন্যায় পরস্পরের মুখপানে চাহিয়া বসিয়া রহিলেন। গোকুল এ কি করিল! পূজ্যপাদ শ্বশুর-মহাশয়কে এ কি ভয়ঙ্কর অপমান করিয়া বসিল !

বিনোদের বেশ একটি বন্ধুর দল জুটিয়াছিল, যাহারা প্রতিনিয়তই তাহাকে মকদ্দমায় উৎসাহিত করিতেছিল। কারণ হারিলে তাহাদের ক্ষতি নাই—জিতিলে পরম লাভ। অনেক দিনের, অনেক আমোদ-প্রমোদের খোরাক সংগ্রহ হয়। আবার মকদ্দমা যে করিতেই হইবে, তাহাও একপ্রকার নিশ্চিত অবধারিত হইয়াছিল। যে হেতু বিনোদের তরফ হইতে যে বন্ধুটি আপোষে মিটমাট করিবার প্রস্তাব লইয়া একদিন গোকুলের কাছে গিয়াছিল, গোকুল তাহাকে হাঁকাইয়া দিয়া বলিয়াছিল, বয়াটে নচ্ছার পাজিকে এক সিকি পয়সার বিষয় দেব না—যা পারে সে করুক্।

কিন্তু এত বড় বিষয়ের জন্য মামলা রুজু করিতে একটু বেশি টাকার আবশ্যক। সেইটুকুর জন্যই বিনোদের কালবিলম্ব হইয়া যাইতেছিল।

দাদার উপর বিনোদের যত রাগই থাকুক, সেইদিন হইতেই কেমন যেন তাহার প্রাণটা কাঁদিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছিল। অত লোকের সম্মুখে অপমানিত হইয়া যেমন করিয়া সে ছুটিয়া পলাইয়াছিল, তাহার মুখের সে আর্ত্ত ছবিটা সে কোন মতেই ভুলিতে পারিতেছিল না। বুকের ভিতরে কে যেন অনুক্ষণ বলিতেছিল—অন্যায়, অন্যায়, অত্যন্ত অন্যায় হইয়া গিয়াছে। অত্যন্ত মিথ্যা ও কুৎসিত অপবাদে অভিহিত করিয়া দাদাকে বিদায় করা হইয়াছে। সেই দাদা যে জীবনে আর কোন দিন এ পথ মাড়াইবে না, তাহা নিঃসংশয়ে বিনোদ বুঝিয়াছিল।

দেশের কৃতবিদ্য যুবকদিগের অনেকেই বিনোদের বন্ধু। সকলেরই পূর্ণ সহানুভূতি বিনোদের উপরে। সেদিন সকালে তাঁহারা বাহিরের ঘরে বসিয়া মাষ্টারমশাইকে ডাকাইয়া আনিয়া অনেক বাদানুবাদের পরে স্থির করিয়াছিলেন, কথার ফাঁদে গোকুলকে জড়াইতে না পারিলে সুবিধা নাই। গোকুল মূর্খ এবং অত্যন্ত নির্বোধ তাহা সকলেই বুঝিয়াছিলেন, সুতরাং তাহাকে উত্তেজিত করিয়া তাহারই মুখের কথায় তাহাকেই জব্দ করিয়া সাক্ষীর সৃষ্টি করা কঠিন হইবে না। কথা ছিল, আগামী রবিবার সকাল-বেলায় দেশের দশজন গণ্যমান্য ভদ্রলোক সঙ্গে করিয়া গোকুলের বাটীতে উপস্থিত হইয়া তাহাকে কথার ফেরে বাঁধিতেই হইবে। এই প্রসঙ্গে কত তামাসা, কত বিদ্রূপ অনুপস্থিত হতভাগ্য গোকুলের মাথায় বর্ষিত হইল; কে কি বলিবেন এবং করিবেন, সকলেই একে একে তাহার মহাড়া দিলেন, শুধু বিনোদ মাথা হেঁট করিয়া নীরবে বসিয়া রহিল। তাহার উৎসাহের অভাব নিজেদের উৎসাহের বাহুল্যে কেহ লক্ষ্যই করিলেন না।

আজ বিনোদ কাজে বাহির হয় নাই, আহারাদি শেষ করিয়া ঘরে বসিয়াছিল, বেলা একটার সময় হঠাৎ গোকুল—কই রে হাবুর মা, খাওয়া-দাওয়া চুকল? বলিয়া প্রবেশ করিল। হাবুর মা শশব্যস্তে বড়বাবুকে আসন পাতিয়া দিয়া কহিল, না বড়বাবু, এখনো শেষ হয় নি।

হয় নি? বলিয়া গোকুল নিজেই আসনটা তুলিয়া আনিয়া রান্নাঘরের দাওয়ায় পাতিল। বসিয়া কহিল, এক গেলাস ঠাণ্ডা

জল খাওয়া দিকি হাবুর মা! তাগাদায় বেরিয়ে এই দুপুর রোদ্দুরে ঘুরে ঘুরে একেবারে হয়রাণ হয়ে গেছি। মা কই রে?

ভবানী রান্নাঘরেই ছিলেন; কিন্তু সে দিনের কথা স্মরণ করিয়া বিপুল লজ্জায় হঠাৎ সম্মুখে আসিতেই পারিলেন না। বিনোদ কাজে গিয়াছে, ঘরে নাই—গোকুল ইহাই জানিত। কহিল, মিথ্যে হাবুর মা, সব মিথ্যে! কলিকাল—আর কি ধর্ম্ম-কর্ম্ম আছে? বাবা মরবার সময় মাকে আমাকে দিয়ে বল্‌লেন, বাবা গোকুল, এই নাও তোমার মা! আমি ভালমানুষ—নইলে বেন্দার বাপের সাধ্যি কি, সে মাকে আমার জোর করে নিয়ে আসে? কেন, আমি ছেলে নই? ইচ্ছে করি যদি, এখনি জোর করে নিয়ে যেতে পারি নে? বাবার এই হ'ল আসল উইল—তা জানিস্ হাবুর মা? শুধু দুকলম লিখে দিলেই উইল হয় না।

হাবুর মা চোখ টিপিয়া ইঙ্গিতে জানাইল, বিনোদ ঘরে আছে। গোকুল জলের গেলাসটা রাখিয়া দিয়া জুতা পায়ে দিয়া দ্বিতীয় কথাটি না কহিয়া চলিয়া গেল।

রাত্রি নটা-দশটার সময় হঠাৎ দোকানের চক্রবর্ত্তী আসিয়া হাজির। জিজ্ঞাসা করিল, মা, বড়বাবু এখনো বাড়ি যান্ নি—এখান থেকে খেয়ে কখন গেলেন?

ভবানী আশ্চর্য্য হইয়া কহিলেন, সে ত এখানে খায় নি। তাগাদার পথে শুধু এক গেলাস জল খেয়ে চলে গেল।

চক্রবর্ত্তী কহিল, এই নাও। আজ বড়বাবুর জন্মতিথি।

বাড়ি থেকে ঝগড়া করে বলে এসেছে, মায়ের প্রসাদ পেতে যাচ্চি! তা হ'লে সারাদিন খাওয়াই হয় নি দেখ্‌চি।

শুনিয়া ভবানীর বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। বিনোদ পাশের ঘরেই ছিল, চক্রবর্ত্তীর সাড়া পাইয়া কাছে আসিয়া বসিল। তামাসা করিয়া কহিল, কি চক্রবর্ত্তীমশাই, নিমাই রায়ের তাঁবে চাক্‌রি হচ্ছে কেমন ?

চক্রবর্ত্তী আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, নিমাই রায় ? রামঃ—সে কি দোকানে ঢুকতে পারে না কি ?

বিনোদ বলিল, শুন্‌তে পাই দাদাকে সে গ্রাস করে বসে আছে ?

চক্রবর্ত্তী ভবানীকে দেখাইয়া হাসিয়া কহিল, উনি বেঁচে থাক্‌তে সেটি হবার জো নেই ছোটবাবু। আমাকে তাড়িয়ে সর্ব্বস্বর মালিক হ'তেই এসেছিলেন বটে, কিন্তু মায়ের একটা হুকুমে সব ফেঁসে গেল। এখন ঠকিয়ে-মজিয়ে ছ্যাঁচড়ামি করে যা দুপয়সা আদায় হয়, দোকানে হাত দেবার জো নেই। বলিয়া চক্রবর্ত্তী সে দিনের সমস্ত ইতিহাস বিবৃত করিয়া কহিল, বড়বাবু একটুখানি বড্ড সোজা মানুষ কি না, লোকের প্যাঁচস্যাঁচ ধর্‌তে পারে না। কিন্তু তা হ'লে কি হয়, পিতৃমাতৃভক্তি যে অচলা —সেই যে বল্‌লেন, মায়ের হুকুম রদ করবার আমার সাধ্যি নেই—তা এত কাঁদা-কাটি, ঝগড়া-ঝাটি—না, কিছুতে না। আমার বাপের হুকুম—মায়ের হুকুম! আমি যেমন কর্ত্তা ছিলাম—তেমনি আছি ছোটবাবু!

বিনোদের দুচক্ষু জ্বালা করিয়া জলে ভরিয়া গেল। চক্রবর্ত্তী

কহিতে লাগিল, এমন বড়ভাই কি কারু হয় ছোটবাবু? মুখে কেবল বিনোদ আর বিনোদ। আমার বিনোদের মত পাশ কেউ করে নি, আমার বিনোদের মত লেখাপড়া কেউ শেখে নি, আমার বিনোদের মত ভাই কারু জন্মায় নি। লোকে তোমার নামে কত অপবাদ দিয়েচে ছোটবাবু, আমার কাছে এসে হেসে বলেন, চক্কোত্তিমশাই, শালারা কেবল আমার ভায়ের হিংসে করে দুর্নাম রটায়! আমি তাদের কথায় বিশ্বাস করব, আমাকে এম্‌নি বোকাই ঠাউরেচে শালারা।

একটু থামিয়া কহিল, এই সেদিন কে এক কাশীর পণ্ডিত এসে তোমার মন ভাল করে দেবে বলে একশ-আট সোণার তুলসীপাতার দাম প্রায় পাঁচশ টাকা বড়বাবুর কাছে হাতিয়ে নিয়ে গেছে। আমি কত নিষেধ করলুম, কিছুতেই শুন্‌লেন না; বল্‌লেন, আমার বিনোদের যদি সুমতি হয়, আমার বিনোদ যদি এম্-এ পাশ করে—যায় যাক্ আমার পাঁচশ টাকা।

বিনোদ চোখ মুছিয়া ফেলিয়া আর্দ্রস্বরে কহিল, কত লোক যে আমার নাম ক'রে দাদাকে ঠকিয়ে নিয়ে যায়, সে আমিও শুনেছি চক্কোত্তিমশাই।

চক্রবর্ত্তী গলা খাটো করিয়া কহিল, এই জয়লাল বাঁড়ুয্যেই কি কম টাকা মেরে নিয়েছে ছোটবাবু! ওই ব্যাটাই ত যত নষ্টের গোড়া। বলিয়া সে কর্ত্তার মৃত্যুর পরে সেই ঠিকানা বাহির করিয়া দিবার গল্প করিল।

ভবানী কোন কথায় একটি কথাও কহেন নাই—শুধু তাঁরই দুই চোখে শ্রাবণের ধারা বহিয়া যাইতেছিল।

চক্রবর্ত্তী বিদায় লইলে বিনোদ শুইতে গেল ; কিন্তু সারা রাত্রি তাহার ঘুম হইল না। কেন এমন একটা অস্বাভাবিক কাণ্ড ঘটিল, পিতা তাহাকে এক ভাবে বঞ্চিত করিয়া গেলেন, দাদা তাহাকে কিছুই দিতে চাহিতেছে না, চক্রবর্ত্তীর মুখে আজ সেই ইতিহাস অবগত হইয়া সে ক্রমাগত ইহাই চিন্তা করিতে লাগিল।

* * * *

বিনোদের বন্ধুরা বিশেষ উদ্যোগী হইয়া কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক সঙ্গে করিয়া রবিবারের সকাল-বেলা গোকুলের বৈঠকখানায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। গোকুল দোকানে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল, এতগুলি ভদ্রলোকের আকস্মিক অভ্যাগমে তটস্থ হইয়া উঠিল। বিশেষ করিয়া ডেপুটিবাবুকে এবং সদরআলা গিরিশবাবুকে দেখিয়া তাঁহাদের যে কোথায় বসাইবে, কি করিবে, ভাবিয়া পাইল না। বিনোদ নিঃশব্দে মলিনমুখে এক ধারে গিয়া বসিল। তাহার চেহারা দেখিলে মনে হয় তাহাকে যেন বলি দিবার জন্য ধরিয়া আনা হইয়াছে।

বাঁড়ুয্যেমশাই ছিলেন, কথাটা তিনিই পাড়িলেন।

দেখিতে দেখিতে গোকুলের চোখ আরক্ত হইয়া উঠিল। কহিল, ওঃ তাই এত লোক। যান আপনারা নালিশ করুন গে, আমি এক সিকি পয়সা ওই হতভাগা নচ্ছারকে দেব না। ও মদ খায়।

আর সকলে মৌন হইয়া রহিলেন, বাঁড়ুয্যেমশাই ভঙ্গি করিয়া হাসিয়া বলিলেন, বেশ, তাই যেন খায়, কিন্তু তুমি ওর

হক্কের বিষয় আট্‌কাবার কে? তুমি যে তোমার বাপের মরণ-কালে জোচ্চুরি করে উইল লিখে নাও নি তার প্রমাণ কি?

গোকুল আগুনের মত জ্বলিয়া উঠিয়া চীৎকার করিয়া কহিল, জুচ্চুরি করেছি? আমি জোচ্চোর? কোন্ শালা বলে?

গিরিশবাবু প্রাচীন লোক। তিনি মৃদুকণ্ঠে কহিলেন, গোকুলবাবু অমন উতলা হবেন না, একটু শান্ত হয়ে জবাব দিন।

বাঁড়ুয্যেমশাই পুরাণো দিনের অনেক কথাই নাকি জানিতেন, তাই চোখ ঘুরাইয়া কহিলেন, তা হ'লে আদালতে গিয়ে তোমার মাকে সাক্ষী দিতে হবে গোকুল।

তিনি যা ভাবিয়াছিলেন, ঠিক তাই। গোকুল উন্মত্ত হইয়া উঠিল—কি, আমার মাকে দাঁড় করাবে আদালতে? সাক্ষীর কাটগড়ায়? নিগে যা তোরা সব বিষয়-আশয়—নিগে যা—আমি চাই নে। আমি যাব না আদালতে; মাকে নিয়ে আমি কাশীবাসী হ'ব।

নিমাই রায়ও উপস্থিত ছিলেন, চোখ টিপিয়া বলিলেন, আহা হা, থাক না গোকুল। কর কি, কি সব বল্‌চ?

গোকুল সে কথা কানেও তুলিল না। সকলের মুখের সম্মুখে ডান পা বাড়াইয়া দিয়া বিনোদকে লক্ষ্য করিয়া তেম্‌নি চীৎকারে কহিল, আয় হতভাগা এদিকে আয়, এই পা বাড়িয়ে দিয়েচি—ছুঁয়ে বল্—তোর দাদা জোচ্চোর। সমস্ত না এই দণ্ডে তোকে ছেড়ে দিই ত আমি বৈকুণ্ঠ মজুমদারের ছেলে নই।

নিমাই ভয়ে শশব্যস্ত হইয়া উঠিল, আহা হা, কর কি বাবাজী! করুক না ওরা নালিশ—বিচারে যা হয় তাই হবে

এ সব দিব্যি-দিলেশা কেন? চল চল, বাড়ির ভেতরে চল। বলিয়া তাহার একটা হাত ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিল।

কিন্তু বিনোদ মাথা তুলিয়া চাহিল না, একটা কথার জবাবও দিল না—একভাবে নীরবে বসিয়া রহিল।

গোকুল সজোরে হাত ছাড়াইয়া লইয়া কহিল, না, আমি এক পা নড়ব না।

উপরদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, বাবা শুন্‌চেন, তিনি মরবার সময় বলেছিলেন কি না, গোকুল, এই রইল তোমাদের দুভায়ের বিষয়। বিনোদ যখন ভাল হবে, তখন দিয়ো বাবা তার যা কিছু পাওনা। ওপর থেকে বাবা দেখ্‌চেন, সেই বিষয় আমি যক্ষের মত আগ্‌লে আছি। কবে ও ভাল হয়ে আমার ঘরে ফিরে আস্‌বে—দিবারাত্রি ভগবানকে ডাক্‌ছি—আর ও বলে আমি জোচ্চোর! আয়, এগিয়ে আয় হতভাগা, আমার পা ছুঁয়ে এদের সাম্‌নে বলে যা, তোর বড়ভাই চুরি করে তোর বিষয় নিয়েছে।

বন্ধুবান্ধবেরা বিনোদকে চারিদিক্ হইতে ঠেলিতে লাগিলেন; কিন্তু সে উঠে না। বাঁড়ুয্যেমশাই খাড়া হইয়া তাহার একটা হাত ধরিয়া সজোরে টান দিয়া বলিলেন, বল না বিনোদ, পা ছুঁয়ে। ভয় কি তোমার? এমন সুযোগ আর পাবে কবে?

বিনোদ উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, না, এমন সুযোগ আর পাব না। বলিয়া দুই পা অগ্রসর হইয়া আসিয়া কহিল, তোমার পা ছুঁতে বল্‌ছিলে দাদা, এই ছুঁয়েচি। আমি মদ খাই—আর যাই খাই দাদা, তোমাকে চিনি। তোমার পা

ছুঁয়ে তোমাকেই যদি জোচ্চোর বলি দাদা, ডান হাত আমার এইখানেই খসে পড়ে যাবে। সে আমি বল্‌তে পার্‌ব না; কিন্তু আজ এই পা ছুঁয়েই দিব্যি করে বল্‌চি, মদ আর আমি ছোঁব না। আশীর্ব্বাদ কর দাদা, তোমার ছোটভাই বলে আজ থেকে যেন পরিচয় দিতে পারি। তোমার মান রেখে যেন তোমার পায়ের তলাতেই চিরকাল কাটাতে পারি। বলিয়া বিনোদ অগ্রজের সেই প্রসারিত পায়ের উপর মাথা রাখিয়া শুইয়া পড়িল।

সমাপ্ত

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে
প্রকাশক ও মুদ্রাকর—শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্‌
২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬